বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

বিবেকানন্দ-মহামণ্ডলে পরিক্রমণশীল
জ্ঞানমার্গের পথিকদের উদ্দেশ্যে
শ্রদ্ধাবনতচিত্তে—

ভূমিকা

'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা' গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও আলোচনাশৈলী সম্পূর্ণ নূতন। স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে ও পরিবেশে যেভাবে চিন্তা ও কর্ম করেছেন সে সকলের ঠিক একটি অনুলিখন নয়, বরং সংকলন এই গ্রন্থ। মোটকথা চিন্তাশীল গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টিমূলক ভাষণ, আলোচনা, চিঠিপত্র ও বক্তব্যের একটি বৈজ্ঞানিক ভাষ্য রচনা করেছেন সাবলীল ভাষায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহজাত। অবশ্য বাইরের প্রকৃতি ও তদানীন্তন সমাজ পরিবেশও সাহায্য করেছিল তাঁর সকল কিছু চিন্তায় ও জীবনকর্মে বিজ্ঞানদৃষ্টি সৃষ্টি করার জন্য। বিশেষ ক'রে তাঁর অখণ্ড জীবনচর্যার মধ্যে ছিল এক অসাধারণ রকমের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাব। তাই যদিও সাধারণ মানবচরিত্রের অনুযায়ী শুরু হয়েছিল তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন-জীবন, তবুও অসাধারণত্ব ছিল তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী (১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ) পৌষ-সংক্রান্তির কৃষ্ণা সপ্তমীতে তিনি করেন জন্মগ্রহণ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত তদানীন্তন কলকাতার বাঙালীসমাজে একজন বিদগ্ধ আইনব্যবসায়ী। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন হিন্দু রমণীর আদর্শ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠী সকলেই ছিলেন বিবেকানন্দের জীবনযাত্রার অনুকূল সহযোগী। প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রতিভা, বিচারশীলতা ও বাগ্মীতার অধিকারী ছিলেন তিনি কিশোরকাল থেকেই। প্রাচ্যদর্শন ও তর্কশাস্ত্রে যেমন ছিল তাঁর অসামান্য অনুরাগ, তেমনি ছিল পাশ্চাত্য দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে। একদিকে কণাদ, গৌতম, কপিল, কুমারিল, পতঞ্জলি, ব্যাস, শংকর ও শংকরপন্থী শাস্ত্রীদের দর্শনমতের ছিলেন অনুরাগী, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি মিল, বেন্থাম, হার্বার্ট স্পেন্সার, হিউম, স্পাইনোজা, কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাউয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদেও অনুরক্ত।

একদিকে পাশ্চাত্যের অহংবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও নাস্তিক্যবাদ যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁর গঠনশীল মনে, তেমনি অপরদিকে প্রাচ্যের নাস্তিক্য এবং অনাস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বস্রোতও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল তাঁর সত্য নির্ধারণের পথে। তাছাড়া উনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙলার ও বিশেষ ক'রে কলকাতার সমাজ ছিল একান্ত সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ডিরোজিও প্রমুখ খ্রীষ্টান অধ্যাপকদের অবাধ প্রচার ও প্ররোচনায় তখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষাবিলাসী অভিজাত হিন্দুদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সংঘাতময় আলোড়ন। তাই অনেকে হয়েছিলেন খ্রীষ্টান এবং অনেকে হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও করেছিলেন কিছুটা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই সমস্যা-সঙ্কুল যুগেই এবং তারি জন্য সন্দেহ-আন্দোলিত ছিল তাঁর বিচারশীল বৈজ্ঞানিক মন হিন্দুধর্মসেবী ও হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষীদের দ্বন্দ্বময় জীবন সংঘাত লক্ষ্য ক'রে।

এই সন্দেহ-সঙ্কুল যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল আবার ব্রাহ্মসমাজ। আধা-খ্রীষ্টান ও আধা-হিন্দু পরিবেশ এবং আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মপরিবেশ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম হয়েছিল শুরু ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সভ্যতার মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই কল্যাণময় ছিল ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান।

স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) এই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে হয়েছিলেন বেশ অনুপ্রাণিত। উপনিষদের বাণী ও ভারতের সত্যোপলব্ধির প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা। কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক হেষ্টী সাহেবের কাছে শুনেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। কেশবচন্দ্রের প্রদীপ্ত ভাষণগুলিতেও তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর ইঙ্গিত। ঘটনাচক্রে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শিমুলিয়া ষ্ট্রীটের সুরেন্দ্র নাথ মিত্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হোল মিলন স্বামীজীর। তাঁর সংগীতপ্রতিভাই দিয়েছিল সেই দর্শনের সুবর্ণময় সুযোগ। স্বামীজীর সংগীত শুনে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে। তাই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ উপনীত হন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সেই তাঁর সম্ভবত দ্বিতীয়বার দর্শন। সে সময়েও সংগীত ছিল বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ মিলনের সহকারী। 'মন, চল নিজ নিকেতনে'

ও 'যাবে কি হে দিন আমার' গানদুটি তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে সেদিন বিবেকানন্দের সন্দেহ-সংঘাতময় মন পেয়েছিল একান্ত সান্ত্বনা ও আশাস্নিগ্ধ আনন্দ; এবং সেই সান্ত্বনা ও আনন্দের মহাপ্রেরণাই করেছিল নরেন্দ্রনাথকে মহাত্যাগী বিবেকানন্দে রূপায়িত।

এতো গেল যুক্তিশীল বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকানন্দের প্রাথমিক সংসার-বিরাগী জীবনের কাহিনী বা ইতিকথা। এর পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস এই পাঁচ বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হয় বিবেকানন্দের জীবনযাপন, শিক্ষা ও অধ্যাত্ম সাধনরহস্যের ইংগিত লাভ। তাঁর সাধন সহকারীদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ এবং আরো অনেকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট (৩১শে শ্রাবণ) শ্রীরামকৃষ্ণের হয় মহাসমাধি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যেরা কঠোর তপস্যায়, শাস্ত্র-আলোচনায়, তীর্থ পর্যটনে ও নর-নারায়ণের সেবায় করেন অতিবাহিত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ পরিভ্রমণ করেন ভারতের সকল তীর্থ, সকল দেশ ও সকল রাজ্য পরিব্রাজকের বেশে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মে তিনি বোম্বাই বন্দর থেকে যাত্রা করেন আমেরিকার পথে। উদ্দেশ্য—শিকাগো সহরে আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান ও ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক ধর্মমতের প্রচার করা। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃশ্য আশীর্বাদ ছিল সেইযাত্রার পিছনে। বিচিত্র দেশের বন্দর অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দ কানাডায় উপনীত হন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মমহাসম্মিলনের অধিবেশন হয় আরম্ভ। সাড়ম্বরে সেই সম্মিলনের হয় উদ্বোধন। বিচিত্র প্রতিকূল পরিবেশ ও ঘটনা প্রবাহ অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দ যোগদান করেন শিকাগোর ধর্মমহাসভায়। প্রথম দিনের ভাষণেই বিচারদৃষ্টি-বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের করেছিলেন মনোজয়। সতেরো দিনের অধিবেশনে তিনি

দিয়েছিলেন বারোটি অগ্নিময়ী ভাষণ। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ উদার মতবাদে আমেরিকাবাসী হয়েছিলেন আকৃষ্ট এবং সমগ্র পাশ্চাত্যের বুকে সৃষ্টি করেছিল এক নূতন আলোড়ন তথা জাগরণ। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারে বিন্দুমাত্রও ছিল না সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ, বিন্দুমাত্রও ছিল না স্বার্থকেন্দ্রায়িত মনোভাব ও অন্ধবিশ্বাস, বরং ছিল সার্বজাতিকতার ভিত্তিতে বিশ্বগ্রাসী প্রেম ও ভালোবাসা, বিজ্ঞান-নির্দেশিত বিচার-বিশ্লেষণ ও সত্যদর্শনের নিরঙ্কুশ ইঙ্গিত। নিউইয়র্কে দেওয়া তাঁর রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের ভাষণে ইহসর্বস্ববাদী আমেরিকাবাসী পেয়েছিলেন জ্ঞান-ভক্তিযোগ-কর্মের সমন্বিত রূপের ধারণা ও সাধনা। পেয়েছিলেন যুক্তি ও তর্কের প্রখর দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার আনন্দস্নিগ্ধ প্রেরণা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বেদান্তবাণী শুধু আমেরিকাবাসীরই বা কেন, সমগ্র পাশ্চাত্যবাসীর সন্দেহসুপ্ত জীবনে এনেছিল জাগরণ।

নিউইয়র্কে স্থায়ী 'বেদান্ত সমিতি'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। ডেট্রয়েটে ও বষ্টনেও অনুরূপ 'বেদান্ত সমিতি' হোল প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজীকে প্রচারকার্যে সহায়তা করার জন্য প্রথমবারে যান স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয়বার যান বিদগ্ধ বেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন থেকে স্বামীজী রওনা হন ভারতের অভিমুখে এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী পৌঁছিলেন কলম্বোয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি উপনীত হন কলকাতায়। কলকাতার নাগরিক ও গুণমুগ্ধ স্বামীজীকে সম্বর্দ্ধনা জানান বিপুলভাবে।

আলমবাজার থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ক্রমে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড় নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের নিয়ম-কানুন রচনা করে সংঘের 'রাজামহারাজ' স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সভাপতি এবং স্বামী সারদানন্দকে করেন সম্পাদক। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর করেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নির্বাচিত হন তার প্রথম সম্পাদক। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (২০শে জুন) স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় লণ্ডনে যাত্রা করেন পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়

প্রচারের কর্মসাফল্য পরিদর্শন করার জন্য। সেবার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। লণ্ডন থেকে পুনরায় নিউইয়র্কে যান ১৬ই আগষ্ট (১৮৯৯)। নিউইয়র্কে প্রচারের কার্য বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করে স্বামী অভেদানন্দের সুষ্ঠু পরিচালনায়। কিছুদিন পরেই আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন স্বামীজী শেষবারের মতো বিদায় গ্রহণ ক'রে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তিনি পৌঁছিলেন ক'লকাতায়। প্যারি, ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমেনিয়া, কনষ্টান্টিনোপল্, মিশর প্রভৃতি দেশে তাঁর বেদান্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার হয়েছিল যথেষ্ট সমাদর। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রে স্বামীজী দেহ রক্ষা করেন মহাসমাধিতে।

স্বামীজীর আব্রহ্মস্তম্বে ব্রহ্মানুভূতির প্রসন্নগম্ভীর বাণী আজও প্রতিধ্বনিত শোনা যায় ভারতের আকাশে বাতাসে দিকদিগন্তে—

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

বিচার-বুদ্ধির দীপালোক তখন জ্যোতিষ্মান বোধি-সূর্যে রূপায়িত, ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন চেতনা তখন বিশ্বানুস্যূত চৈতন্যে পরিণত।

বেদান্তের দীপ্ত প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিতরূপ মহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পরিবেশিত হোল ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার লিখিত "বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা" গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে। স্বামীজীর দর্শন চিন্তা, স্বামীজীর শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মচিন্তা, কিংবা স্বামীজীর অসামান্য ত্যাগ, তপস্যা ও প্রজ্ঞাপ্রতিভার সুষ্ঠু আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচিন্তার করেছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এবং তার অনুষঙ্গীরূপে আলোচনা করেছেন স্বামীজীর ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাধারার। প্রতিভাবান লেখক এর আগে আরো একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস" সম্পর্কে। সুলিখিত ও উপাদানসমৃদ্ধ সেই গ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থ "বিবেকানন্দের

বিজ্ঞান চেতনা" এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত হোলেও বস্তুত বারোটি বিভাগেই আলোচিত। তাঁর বারোটি আলোচ্য বিষয় বস্তু হোল—

পুর্বলেখ : প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রথম পর্ব : বৈজ্ঞানিক মেজাজ

দ্বিতীয় পর্ব : স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান

তৃতীয় পর্ব : কারিগরি বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

চতুর্থ পর্ব : বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম ও বিবেকানন্দ

পঞ্চম পর্ব : স্বামীজী, ক্রমবিকাশবাদ ও সৃষ্টিরহস্য

ষষ্ঠ পর্ব : অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

সপ্তম পর্ব : বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান

অষ্টম পর্ব : বিবেকানন্দের নৃতাত্ত্বিক মতবাদ

নবম পর্ব : স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী

দশম পর্ব : বিবেকানন্দ—জগদীশচন্দ্র—নিবেদিতা

একাদশ পর্ব : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুবিভাগের ধারা দেখলেই বোঝা যায় যে, সুপণ্ডিত গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চিন্তার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোচনা করেছেন স্বামীজীর সকলরকম চিন্তাধারাকে অনুসরণ ক'রে। লেখকের মূল আলোচ্য বিষয় যদিও কেন্দ্রায়িত বিবেকানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টিব উপর, তবুও স্বামীজীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মদৃষ্টির আলোচনাকেও করেছেন গ্রন্থ-উপাদান।

গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সাবলীল। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি নূতন দিকের উপর করেছেন তিনি আলোকপাত প্রাচীন ও নবীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, তত্ত্ব ও বিশ্লেষণী ধারার অনুসরণ ক'রে। প্রশংসনীয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনার সাংস্কৃতিক গতি। আসল কথাও তাই যে, ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব-আলোচনার ধারাই হওয়া উচিত এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণকে ভিত্তি ক'রে। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা বিজ্ঞানদৃষ্টিসেবী স্বামী অভেদানন্দের কথায় বলি—

"The twentieth century may be called the age of Science

and reason. In this age, everything that is based upon scientific truth or upon rational foundation, appeals to our minds, and we accept it as truth. Science today rules over our thoughts and reason and our present tendency is to make all physical and mental activities harmonize with the laws explained by modern Science."......

"The twentieth century needs a religion which will be in perfect harmony with all the truths, discovered by modern science, which must be based upon the principle of unity in Variety, and which should regard the material and efficient cause of the Universe as one and the same."

"The twentieth century needs a religion which will advocate freedom of thought, freedom of speech, and at the same time, which will be in perfect harmony with the conclusions of modern scientific researches, a religion which will harmonize with the monistic philosopy, and every step of which shall be founded upon the solid rock of truth, unassailable by the critics whether of higher or of lower order."......

বিজ্ঞানদৃষ্টির এখানেই সার্থকতা। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বিশ্বসমাজে ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্বমীমাংসাও বিজ্ঞানদৃষ্টিকে অতিক্রম বা অবহেলা করে সার্থক রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। পরিবর্তনশীল এই জগৎ ও পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সমাজ। সুতরাং বর্তমান সমাজবাসী মানুষের মন ও চিন্তাধারা কোনদিনই কখনো বিজ্ঞানদৃষ্টিকে ও বিজ্ঞানবিচারকে অতিক্রম করতে পারবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের ও সমাজের আদর্শ পথনির্দেশক; সুতরাং তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ ও পথনির্দেশ বর্তমান যুগমানবের যে কল্যাণপ্রদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা তাই ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার লিখিত গ্রন্থ "বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা"কে অভিনন্দন জানাই আন্তরিকভাবে এবং কামনা করি তাঁর যাত্রাপথ হোক সচল বর্তমান বিজ্ঞানপ্রভাবিত যুগের মানবচিন্তাকে ও মানবধর্মকে প্রেরণাদীপ্ত ক'রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নিবেদন

অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন স্বামী বিবেকানন্দ তো ধর্মপ্রবক্তা, তিনি আবার বিজ্ঞানী হ'লেন কি ক'রে? সত্যিই বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন, তিনি কলেজে বিজ্ঞানের পাঠ নেননি, গবেষণাগারে কাটাননি বিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু তিনি শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সযত্নে যে মেজাজ ও মনটিকে লালন করে গেছেন তা বিজ্ঞানীর। সত্যকে জানবার আগ্রহ তাঁর ছিল অসীম। যাচাই না ক'রে কোন কিছুকেই তিনি গ্রহণ করতেন না। এ বৃত্তি বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞানী পড়েন, শোনেন অথচ যা পড়েছেন বা শুনেছেন তাকেই অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণাগারে তার প্রমাণ না পাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে যাচাই ক'রে নিতেন প্রতিটি তত্ত্ব। তিনি ছিলেন এক ধর্মসংঘের মধ্যমণি, কিন্তু সমস্ত প্রচলিত শাস্ত্র মতকে অন্ধের মত আঁকড়ে থাকেননি। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শাস্ত্রের অনুশাসন বা সিদ্ধান্ত বিচার করেছেন, সমালোচনা করেছেন। অবৈজ্ঞানিক মনে হ'লে তাকে নিরাসক্ত চিত্তে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন যেমন আবর্জনা সাফ করা হয়।

বিজ্ঞান যে তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ তাঁর রচনা-সমূহের অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। তার জন্যে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ ও উপলব্ধির। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে যেমন পুনরুজ্জীবিত ক'রে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি তাঁর জীবিতাবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ববিভাগের অগ্রগতিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। তিনি চেয়েছেন সমন্বয় সাধন করতে। তার প্রয়াস তাঁর রচনার বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এর চেয়েও একটা বড় কথা আছে। বিজ্ঞানীর মৌলিক চিন্তা শক্তি থাকে। পাশ্চাত্য খণ্ডে বহু দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানীর নাম করা যায় যাঁরা প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানের ডিগ্রী না নিয়েও বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। তার কারণ তাঁদের মৌলিক চিন্তা শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ সেই পরমধনের অধিকারী ছিলেন। তা না হ'লে

বিশ্বের বিখ্যাত তড়িৎ-বিজ্ঞানীদের সমাবেশে স্বামীজীর ঐ বিষয়ে আলোচনা শুনে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যান্বিত কেন!

স্বামীজী যখন বিদেশে তখন সে দেশে বিজ্ঞানের রথ এগিয়ে চলেছে প্রবলভাবে। সেই বিজ্ঞানবাদী দেশে ধর্মকে তিনি ক'রে তুললেন সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি জানতেন পাশ্চাত্য খণ্ড বিনা বিচারে প্রাচ্যের বক্তব্য মেনে নেবে না। তাই তিনি সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা ক'রে তুলে ধরলেন তাদের কাছে। এ কাজ যে কত দুঃসাধ্য তা অনুমান করাও শক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বিজ্ঞানীর আর একটি ধর্ম বর্তমান। বিজ্ঞানী কোন সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করেন না। যদিচ নিউটনের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা অনেকটা 'গোঁড়া' হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি অন্ধ অনুকরণের প্রয়াস ছিল না। তা না হলে নিউটনের জগতে আঘাত আসত না। ডারউইন যা বলেছেন, মেণ্ডেলের তত্ত্ব তাকে দিল প্রবল ধাক্কা। পরবর্তী অধ্যায়ে আরো পরিবর্তন এসেছে। ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বিষয়েও একই কথা। আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর নিউটনীয় চিন্তাধারার জগতে কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা কোন মতবাদকেই চিরসত্য বলে মনে করেন না। একদিন জানা ছিল পরমাণু অবিভাজ্য। আজ সে ধারণার মূলোচ্ছেদ হয়েছে। বিজ্ঞানীর মন যদি কোন বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে নতুন চিন্তার পথ হয় রুদ্ধ। তিনি হবেন নিরাসক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের মনও ছিল নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মন। একারণেই তিনি শুধু শাস্ত্র থেকে আগাছা তুলে ফেলেননি, বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধেও নতুন চিন্তাধারা এনেছেন। ক্রমবিকাশ তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে তিনি যে সব বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন অধুনা বিজ্ঞানীদের কণ্ঠে ঐ জাতীয় বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। 'ভারতীয় নৃতত্ত্ব' বিষয়ে তিনি বহুদিন আগে যা ব'লে গেছেন তা আজ বহুল পরিমাণে স্বীকৃত।

বিবেকানন্দ বলেছেন বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাজে, ও উদ্দেশ্যগতভাবে এক। উভয়ই আধ্যাত্মিক অনুশাসন। এমন কি পার্থিব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয়েও দু'য়ের মধ্যে বহু মিল আছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে

উভয় মতবাদের প্রাথমিক বক্তব্য হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় 'আত্মার বিকাশের প্রক্রিয়া'। বেদান্ত একে বলেছেন 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রথা। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় আধ্যাত্মিক সত্য বা নিয়মের কোন স্থান স্বীকৃত হয়নি, তাহলেও বিংশ শতকের অনেক বিজ্ঞানী, যেমন টেলহার্ড দ্য সার্ডিন, সার জুলিয়ান হাক্সলি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড়বাদকে শিথিল করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং বিজ্ঞানচিন্তার জগতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। এমন কি বিগত শতকেও ডারউইনের সহযোগী টমাস হাক্সলি বিজ্ঞানের যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ বা গোঁড়ামি যেমন জড়বাদ ইত্যাদির প্রতিবাদ করেছেন এবং জড়বাদকে বলেছেন অনাহুত। বর্তমান শতকে এই প্রতিবাদ (জড়বাদের বিরুদ্ধে) বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীদের তরফ থেকেই এসেছে।

১৮৯৬ সালে লণ্ডনে 'ব্রহ্ম ও জগৎ' বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের গতি কোন্‌দিকে তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? হিন্দুজাতি মেটাফিজিকস্ (জড়-দর্শন), যুক্তিবাদ এবং মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় জাতি সমূহ বহিঃ প্রকৃতি থেকে যাত্রা সুরু করেছিলেন এবং এখন তারাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনোবিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা সেই একক সত্তায়, সেই বিশ্ব সত্তায়, প্রতিটি পদার্থের অন্তরাত্মায়, সমস্ত বস্তুর সার ও সত্যে পৌঁছাতে পারি। জড় বিজ্ঞানের সাহায্যেও আমরা সেই একক তত্ত্বে হাজির হতে পারি……।'

দুঃখের কথা বিবেকানন্দকে সমগ্র বিশ্ব জানে সন্ন্যাসী রূপে। তিনি বিজ্ঞানী নন। কাজেই তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক মন্তব্য সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করবার কোন প্রয়াস হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের এই দিকের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

গ্রন্থের প্রথমে প্রাক্‌-বৈদিক; বৈদিক ও বেদোত্তর যুগের বিজ্ঞান ভাবনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছি। একই সঙ্গে রচিত হয়েছে 'প্রাচীনভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেস' শীর্ষক একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়টি রচনা করবার সময় বিশেষ সাহায্য ও উদ্দীপনা পেয়েছি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে।

মূল গ্রন্থ সুরু হয়েছে 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' অধ্যায় দিয়ে। বৈজ্ঞানিক মন কি ও স্বামী বিবেকানন্দের 'বিলে' অবস্থাতেও সত্যকে জানবার প্রতি আগ্রহ প্রবল ছিল তা এই অধ্যায়ে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি। বড় হয়ে ঐ স্পৃহা প্রবলতর হয়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তর্ধানের পর বিবেকানন্দের এই বৈজ্ঞানিক মন আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কর্মে, চিন্তায় সর্বত্র তিনি বাস্তববাদী। 'স্বামীজী ও বিজ্ঞান', 'কারিগরি শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে তা আলোচিত। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান যে একই সত্যে উপনীত হবার তিনটি স্বতন্ত্র পথ মাত্র এ বিষয়ে স্বামীজীব বক্তব্য আলোচনা করেছি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের মতবাদের সাহায্যে। ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য যে আধুনিক তা আলোচনা করেছি বিস্তৃতভাবে 'বিবেকানন্দ ও ক্রমবিকাশ-বাদ' অধ্যায়ে। মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্যকে পর্যালোচনা করেছি আধুনিক বিজ্ঞানেব আলোতে এবং দুটি পৃথক অধ্যায়ে।

বিবেকানন্দ বিদেশের বহু বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসেছেন। যেমন নিকোলা টেস্‌লা, হিরাম ম্যাকসিম, লর্ড কেলভিন্‌, অধ্যাপক হেলম্‌হোলৎস্‌ ইত্যাদি। এঁদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের কথা যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী' অধ্যায়ে। জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ— উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেই কাহিনী 'বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্র-নিবেদিতা' অধ্যায়ে বলতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ যে কেবলমাত্র দর্শন, কলা ও সঙ্গীত জগতের খ্যাতিসম্পন্ন আচার্য ও গবেষক তা-ই নয়, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই তখন শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে গেলাম বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য ক'রে। অনেক কাজের ভীড়েও সযত্নে তিনি পাঠ করেছেন পাণ্ডুলিপি। ধর্ম, দর্শনের নানা বক্তব্য তিনি সরল ক'রে বুঝিয়েছেন এবং ঐ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা ক'রে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহঃসভাপতি শ্রদ্ধেয় স্বামী ওঁঙ্কারানন্দ মহারাজ তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন এই পাণ্ডুলিপি আলোচনা

ক'রে। তিনি দিয়েছেন অকৃত্রিম উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ। তাঁকে জানাই অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ এই গ্রন্থ প্রণয়নে বহুমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন বন্ধুবর অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর (গোলপার্ক) লাইব্রেরীর কর্মীরা আমাকে সাদরে সাহায্য করেছেন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করে। এঁদের মধ্যে শ্রীননী দাসের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এঁদের সকলেরই প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যুগান্তর দৈনিক পত্রিকার 'সাময়িকী'র পৃষ্ঠাতে ঐ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুর অনুকূল্যে আমার লেখা দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটি—'স্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী', অপরটি—'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশবাদ'। স্বামীজী সম্পর্কে এ ধরণের কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে বা পরেও প্রকাশিত হয়েছে ব'লে জানিনে। পরে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৭৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আমার লেখা 'স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা' ও আর একটি সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ক্রমবিবর্তনবাদ'—এই দুটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারা শক্ত। তবুও এই দুঃসাহসিক ব্রতে এগিয়ে গেছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কাজেই তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। এর মধ্যে অজ্ঞানতা প্রসূত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। পাঠক সাধারণ যেন তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় ডি. মেহ্‌রাজীকে। সুপণ্ডিত মেহ্‌রাজী এই গ্রন্থ রচনার কাজে যে ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তা আমার কাছে দুর্লভ পাথেয় ছিল।

-অমিয়কুমার মজুমদার

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতে
বৈজ্ঞানিক-গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

স্বামী বিবেকানন্দ যখন কিশোর তখন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রদীপ জ্বলছিল না বললেই চলে। তার আগে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে গাঢ় তমিস্রা। বিজ্ঞানের দীপ একেবারে নিভে ছিল। পাশ্চাত্য জগত জাগতে আরম্ভ করলো অষ্টাদশ শতক থেকেই। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহ্নবীধারা প্লাবিত করলো প্রাচ্য তথা ভারতের ভূমি। কিন্তু এইটেই ভারতের ইতিহাস নয়। তার আগে বহু শতকের প্রদীপ্ত ইতিবৃত্ত। তখন সমগ্র পাশ্চাত্যখণ্ড অজ্ঞানতার চির সুষুপ্তিতে মগ্ন। ক্রমে জাগলো গ্রীস, রোম। খ্রীষ্টের জন্মের বহু বহু বছর আগেকার দিনের ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সেই সোনালী দিনের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী ঋষিকণ্ঠের বাণী, তাঁদের প্রজ্ঞার আলোক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছিল অনেক জাতির। ব্রিটিশ বা আমেরিকার পণ্ডিতদেরও অধিকাংশ ভারতের অবদান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এই কুণ্ঠা সত্যকে অবলুপ্ত করবার অপপ্রয়াস। কিন্তু সত্য চির অম্লান, তা ভাস্বর। তাই অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকরা অতীত ভারতকে 'বিজ্ঞানের আলোক-বর্জিত' বলে বর্ণনা করে জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেও সত্য সত্যই।

একথা সত্য যে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পর থেকেই ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে আসে তথাকথিত ধর্মের অনুশাসনের চাপে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোকধারা বইতে সুরু করে। তখন ভারতে নিয়মিত বিজ্ঞানচর্চা 'দূর অস্ত্'।

ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং তা যে উনবিংশ শতকের ভারতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল সেকথাও অবশ্য স্বীকার্য। একই সঙ্গে উচ্চার্য প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক-গবেষণার ইতিহাস। বিজ্ঞানের জগতে তার মূল্য কম নয়। অতীত ভারতের ঋষিরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সব কথা জানতেন বা বলে গেছেন একথা বলবো না। কিন্তু যে কাজ করে গেছেন তাকে স্মরণ করবো শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গৌরব-গাথা যাঁরা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন তাঁদের মধ্যে স্মরণ করি দুই মহান আচার্যকে—প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন। তার মানে এই নয় যে তিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন। স্বাদেশিকতার মহামন্ত্রে প্রজ্জ্বলন্ত মহামনীষী বিবেকানন্দ ভারতের কীর্তিকথা প্রচারে হয়ে উঠেছিলেন সোচ্চার। তা কি শুধুই মিথ্যা স্তবগান না সত্য ঘটনা। তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক-গবেষণার ইতিহাস।

প্রাক্-বৈদিক যুগ

প্রাক্-বৈদিক যুগে ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা থেকে। খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-জন্মের দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে কোন এক সময়ে সিন্ধু-সভ্যতার অবসান ঘটে। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাক-বৈদিক ভারতবর্ষের নাগরিক-জীবন, শিল্প-বাণিজ্য, পরিধেয়, খাদ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি

প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশ ধারণা করা যায়। তাঁরা যে রসায়ন, পূর্ত-বিদ্যা ও কারিগরি বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সিন্ধু-সভ্যতায় গণিত-চর্চার বেশ সুন্দর ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা-চানহুদড়োর সর্বত্র নানা ধরনের বহু বাটখারা পাওয়া গেছে। এগুলির অধিকাংশ ঘন বা cube-এর মতো। কিন্তু নিখুঁতভাবে গড়া। ছোট থেকে বড়ো ওজনগুলির পারস্পরিক অনুপাত যথাক্রমে ১, ২, ৮/৩, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০ এবং ১২৮০০ সংখ্যাগুলির অনুপাত। এর মধ্যে '১৬' প্রধান বড় একক।

গৃহ-নির্মাণ, নগর-পরিকল্পনা, স্থাপত্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার অধিবাসীরা যে পারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' ১ম খণ্ডে এ সম্পর্কে মূল্যবান ছবি আছে। শ্রীযুক্ত সেন সংক্ষেপে প্রাক-বৈদিক যুগে বিজ্ঞানচর্চার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রাক্-বৈদিক যুগে বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প নিয়েও যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার কর্মকারেরা সোনা, রূপা, তামা, পিতল, সীসা এই পাঁচটি ধাতুর সঙ্গে পরিচিত ছিল। লোহার ব্যবহাব তারা জানতো না। প্রাচীনকালেব সুপরিচিত cire perdue পদ্ধতিতে পিতল ঢালাই-এর কাজ হতো। পিতলের তৈরী কুড়ুল, খড়্গ, বর্শা, করাত, ক্ষুর ইত্যাদি কয়েকটি যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। তখন সীসাঞ্জন, সেরুসাইট, হিঙ্গুল, শ্বেতসীসক, জিপসম্, চুন প্রভৃতির ব্যবহার ছিল—তা দেখে মনে হয় তাদের রসায়ন সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ভেষজ ও চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান কতদূর ছিল তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি। কয়লার মতো কালো রং-এর এক ধরনের জিনিস কয়েকটি মাটির বাসনের মধ্যে পাওয়া গেছে। এই দ্রব্যটি জলে গুলে গিয়ে গাঢ় বাদামী রং-এর

দ্রবণ তৈরী করে। শিলাজিতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বর্তমান বলে অনুমিত হয়। শিলাজিত পেটের অসুখ, বাত, বহুমূত্র, যকৃতের রোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কাট্‌ল মাছের (সামুদ্রিক) হাড় মাটির পাত্রে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই হাড় চিবোলে খিদে পায়। চোখ, কান, গলার রোগে এই মাছের হাড় ওষুধের কাজ করে।

সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী বি. বি. লাল বলেছেন প্রাক-হরপ্পা যুগের সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। রূপার, আলমগীরপুর, লোথাল কালিভাঙ্গানে এই সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। লোথালে (গুজরাটে, কাম্বে উপসাগরের কাছে) দু'কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ একটি পোতাশ্রয়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য এটি বিশ্বের প্রাচীনতম পোতাশ্রয়। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত সভ্যতা ও হরপ্পার সভ্যতার মিল থাকলেও কোন কোন বিষয়ে প্রাক-হরপ্পা যুগের স্পষ্ট নিদর্শনও আছে। একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতা শুধু মাত্র উপত্যকার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এখন প্রমাণ করতে হবে যে নতুন আবিষ্কৃত এই সভ্যতার নিদর্শন তা স্বতন্ত্র সভ্যতার না এ থেকেই সিন্ধু সভ্যতা উৎসারিত হয়েছে। সে যাই হোক না কেন, পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আমাদের বিস্মিত করে। হাজার হাজার বছর আগে যখন পাশ্চাত্যখণ্ড সম্পূর্ণ অন্ধকারে, তখনই ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক-গবেষণার প্রবল উদ্দীপনা।

বৈদিক যুগ

বৈদিক সভ্যতার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে বৈদিক যুগের প্রথম

পর্যায় খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৫০০ অব্দ। অনুমান করা হয় যে বেদের মধ্যে প্রাচীনতম 'ঋক্-সংহিতা'র রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে সুরু করে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কিছু আগে পর্যন্ত। সাম, যজুঃ, অথর্ব সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল খুব সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ নবম ও অষ্টম শতকে। তবে এসব রচনার সূত্রপাত আগে থেকে হওয়া অসম্ভব নয়। উপনিষদের প্রাচীনতম অংশ রচনার কাল খ্রীঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতকে ও রচনার সর্বশেষ কাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতক বলে অনুমিত হয়। বৈদিক যুগে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

গণিত ঃ বৈদিক ঋষিরা গণিত অর্থে সাধারণতঃ পাটিগণিত বা জ্যোতিষকে বুঝতেন। জ্যামিতি বা রেখাগণিতকে কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান সর্বোচ্চ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে আছে—

'যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মনয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতম্ ॥'

(বেদাঙ্গজ্যোতিষ, ৪)

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সমস্ত বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে গণিতের অবস্থিতি।

বৈদিক হিন্দুদের গণনা পদ্ধতি দশমিক। যজুর্বেদ সংহিতায় এক, দশ; শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০), প্রভৃতি সংখ্যার নামকরণ পাই। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ১, ৩, ৫, ১৯, ২৯, ৩৯,……৯৯ প্রভৃতি ও বাজসনেয়ী সংহিতায় ৪, ৮, ১২,……৪৮ এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ২৪, ৪৮, ৯৬,……৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬ প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায়, বাজসনেয়ী সংহিতায় যে

প্রগতির উল্লেখ করা হয়েছে তা সমান্তর প্রগতি (Arithmatic Progression)। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতিটি গুণোত্তর প্রগতির (Geometric Progression) দৃষ্টান্ত, সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের সঙ্গে বৈদিক হিন্দুরা পরিচিত ছিলেন।

বেদী তৈরী করা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী নির্মাণ থেকে যে শুধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তা নয়, বীজগণিতেরও প্রাথমিক বিকাশ এখান থেকেই ঘটে। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতির সমস্যা থেকে উদ্ভূত একঘাত, দ্বিঘাত সমীকরণ; নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানেব বিষয়ে বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 'মহাবেদী'র উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। এই মহাবেদী হলো একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম।

বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল 'শুল্ব'। শুল্বকারগণ ঋজু-রেখার ক্ষেত্র রচনায়, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিরূপণে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত করতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পিথা-গোরাসের উপপাদ্য বলে যে উপপাদ্যটি বিখ্যাত, তার আবিষ্কার এদেশেতেই। পিথাগোরাসের বহু আগে আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক শুল্বকারেরা এই উপপাদ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। বিদেশী পণ্ডিতেরাও মনে করেন যে এটি ভারতীয় দান। অনেকে মনে করেন তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকালেই এটি আবিষ্কৃত হয়। বৃত্ত, বর্তুল (Sphere), শঙ্কু (Cone), পিরামিড (Pyramid) প্রভৃতি ক্ষেত্রের আয়তন ও ঘনমান নির্ণয় সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা: বৈদিক যুগের প্রায় মাঝামাঝি কালে ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদি রচনার সময়ে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যার বেশ অগ্রগতি হয়। সে যুগে জ্যোতিষকে স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে জ্ঞান করা হতো।

প্রথম দিকে বৈদিক হিন্দুরা ৩০ দিনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ দিনে বছর ধরে পঞ্জিকা তৈরী করতেন। আবার ১৩ মাসেও বছর ধরা হতো। ত্রয়োদশ মাসকে বলা হতো মলমাস।

ঋক্-সংহিতায় সূর্যের সাতটি রশ্মির উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য তা সূর্যরশ্মির সাতটি রং সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচায়ক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে সূর্য বায়ু প্রবাহের কারণ। এই গ্রন্থে সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সূর্য প্রকৃতপক্ষে উদিত হয় না বা অস্তও যায় না। একদিকে যখন রাত্রি, অন্যদিকে তখন দিন। ঋক্ সংহিতার একটি সূক্তেও এই জ্ঞানের আভাস মেলে। বৈদিক সাহিত্যে একথাও বলা হয়েছে যে সূর্যের শক্তির প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশের গ্রহমণ্ডল যথানির্দিষ্ট স্থানে আছে।

ঋগ্বেদের কাল থেকে ভারতীয়রা সাতটি গ্রহ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কয়েকটির বর্তমান নাম ঋগ্বেদের সময়ে যা ছিল তাই চলে আসছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র তাদের অন্যতম। চাঁদের যে নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোর প্রতিফলনে তা আলোকিত হয় এ বৈজ্ঞানিক তথ্য বৈদিক যুগেও জানা ছিল। ঋক্-সংহিতায় এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সাতাশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এক উক্তি থেকে জানা যায় প্রত্যহ সূর্যের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে তাঁরা সূর্যের গতি নির্ণয় করতেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিরা যে কথা বলেছেন তা আধুনিক। ঋক্-সংহিতার কয়েকটি সূক্ত (৫।৪০।৫-৯) পড়লেই তা বোঝা যাবে।

অথর্ব সংহিতায় একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে রাহুর গ্রাসের ফলে যে সূর্যগ্রহণ হয় তা প্রচলিত উপকথা মাত্র।

বৈদিক হিন্দুদের রাশিচক্র সংক্রান্ত জ্ঞান ঋক্-সংহিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লাডউইগ, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য,

একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনুমান করেছিলেন। বৈদিক যুগেই ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্কের ইতিহাস আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। গ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান এসময়ে বেশ উন্নত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে বৈদিকযুগেব পঞ্জিকা বলা যেতে পারে। এ সময়ে হিন্দুরা ৩৬০ দিনে বছব হয় এ গণনার অভ্যাস ছেড়ে, ৩৬৬ দিনে বছব হয় বললেন। নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান খুবই উন্নত ধরনের ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যা: আয়ুর্বেদ: অথর্ববেদে শারীববৃত্তের জ্ঞান সুস্পষ্ট। পরে চিকিৎসাবিদ্যাকে অথর্ববেদ থেকে আলাদা করে আয়ুর্বেদ বা পঞ্চমবেদ রচনা করা হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যেও চিকিৎসাবিদ্যাব নানা আলোচনা আছে। আয়ুর্বেদে বর্ণিত ত্রিদোষবাদের কথা প্রথম বলা হয়েছে 'ঋক্-সংহিতায়'। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' নরকঙ্কালেব অস্থির সংখ্যা ও পরিচয় ঠিকভাবেই দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদের নানা মন্ত্রে ও স্তোত্রে শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদে (১) কায়তন্ত্র (সাধাবণ চিকিৎসাবিদ্যা), (২) শল্যতন্ত্র (শল্য ও ধাত্রীবিদ্যা), (৩) শালাক্যতন্ত্র (চোখ, কান, নাক গলাব চিকিৎসা), (৪) ভূতবিদ্যা (মনোবিকার, উন্মাদ রোগেব আলোচনা ও চিকিৎসা), (৫) কৌমারভৃত্য (শিশু চিকিৎসা), (৬) অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়া বিষয়ক আলোচনা), (৭) রসায়নতন্ত্র (রসায়ন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি), (৮) বাজীকবণতন্ত্র (কামজ পুনর্যৌবন প্রদান সম্বন্ধীয়) আলোচিত হয়েছে। সমস্ত শারীরবৃত্তের এমন সুন্দর আলোচনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশের ইতিহাসে নেই। এই প্রসঙ্গে

ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, পুনর্বসু, অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষরপাণি, সুশ্রুত, জীবক কোমারভচ্চ, চরক, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শল্যবিদ্যায় হিন্দু চিকিৎসকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্লাষ্টিক-সার্জারীর উদ্ভব এদেশেতেই। সুশ্রুত তার প্রবর্তক।

উদ্ভিদবিদ্যা: প্রাচীনকালে উদ্ভিদবিদ্যার অন্য নাম ছিল ভেষজ-বিদ্যা। বৃক্ষায়ুর্বেদও বলা হতো। অঙ্কুরোদ্ভেদ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেছেন যে উপযুক্ত ঋতু, উত্তম ক্ষেত্র ও উপযুক্ত জলসেচন ছাড়া তা সফল হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান বলে বায়ু, আলো, তাপ ও জল সফল অঙ্কুরোদ্গমের প্রধান উপাদান। বৈদিক যুগে এখনকার মত বৃক্ষ, গুল্ম, কন্দ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় উদ্ভিদের প্রধান দুই অংশ মূল ও তুলের (shoot) উল্লেখ করে, তুলের বিভিন্ন অংশ, কাণ্ড, বৎস বা শাখা, ফুল ও ফলের বর্ণনা আছে।

ভেষজগুণ অনুসারে চবক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এক—বিরেচন (purgatives), দুই—অনুপান (astringents)। তাঁর মতে প্রথমটির সংখ্যা ৬০০ ও দ্বিতীয়টির ৫০০। সুশ্রুত সমস্ত উদ্ভিদকুলকে ৩৭টি গণে ভাগ করেছেন।

আহারের উপযোগিতা অনুসারে চরক উদ্ভিদেব দুটি ও সুশ্রুত পনেরটি বিভাগ করেছেন। চরকের ছয় বর্গ হলো—শুকধান্য (cereals), শমীধান্য (pulses), শাক (potherbs), ফল (fruits), হরিত (vegetables) এবং ইক্ষু (sugar cane)। গাছের মূল মাটির জল শোষণ ক'রে নেয় এবং সেই জল তাপ ও বায়ুব সাহায্যে-পাতায় পৌঁছে খাদ্যে পবিণত হয় এ তথ্য হিন্দুরা অনেক আগে জানতেন। আরও বিস্ময় যে উদ্ভিদের অনুভূতির কথা মনুসংহি-তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ'।

বেদোত্তর যুগ

গণিত ঃ ভারত-ইতিহাসে বেদোত্তর যুগ দেড় হাজার বছর চলেছে। বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে জ্যোতিষ শাখা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ লাভ করে। বেদোত্তর যুগে ভারতে দশমিক অঙ্কপাতনের (decimal notation) আবিষ্কার হয়। সংখ্যা লেখার এই নতুন দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে বৈজ্ঞানিক জগতে উচ্চতর গবেষণা সম্ভবপর হতো না বললেই চলে। 'শূন্য' ভারতের আবিষ্কার।

বীজগণিতের মোট তথ্যগুলি আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জানতেন। তাঁদের রচনায় বীজগণিতের নিম্নলিখিত প্রধান ক্রিয়াগুলির পরিচয় মেলে—(১) বর্ণমালা দ্বারা অজ্ঞাত রাশির নির্দেশ, (২) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংজ্ঞার গুণন ও ভাগ, (৩) ঘাত (power) ও সূচকের (exponent) ব্যবহাব, (৪) সমীকরণের ব্যবহার-এ আর্যভট সবল ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমীকরণ ও প্রথম ডিগ্রির অনির্ণীত সমীকরণের সমাধান জানতেন। ব্রহ্মগুপ্ত দ্বিতীয় ডিগ্রী পর্যন্ত জানতেন। আর্যভট উদ্‌ঘাতন (involution) ও অবঘাতনের (evolution) নিয়মাবলী, সমান্তর শ্রেণী (Arithmatic progression), গুণান্তর শ্রেণী (geometric series), সরল সংখ্যা ও তার বর্গমূল ও ঘনমূলের প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হিন্দুরা ত্রিকোণমিতিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। তাঁরা সাইন, কোসাইনের অপেক্ষক (function) নির্ণয় করেন। তাঁরা ক্যালকুলাস জানতেন। পেশোয়ারের কাছে বাখ্‌শালী গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন পুঁথিতে বীজগণিত ও পাটিগণিতের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও বহু জটিল বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আর্যভট তাঁর গ্রন্থে বৃত্ত ও ত্রিভুজের ধর্ম (property)

সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম চার খণ্ডে যে সব উপপাদ্য আছে তার প্রায় সবকিছুই হিন্দুদের জানা ছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা ঃ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কথা আগেই বলা হয়েছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে প্রতি পাঁচ বছরে এক যুগ ধরা হয়েছে। প্রতি যুগের মধ্যে বর্ষ, মাস, মুহূর্ত, নক্ষত্রের উদয়, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দিন, রাত্রি, ঋতুপরিবর্তন, বিষুব, অয়ন প্রভৃতির বিবরণ আছে। এর পরবর্তী যুগে অনেক জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলি 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। এ পর্যন্ত মোট আঠারটি সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে—সূর্য, পৈতামহ, বাশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কাশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমক বা লোমশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু, শৌনক, পৌলিশ ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৈতামহ, বাশিষ্ঠ, পৌলিশ অনেকাংশে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুবর্তী। সূর্য সিদ্ধান্ত একটি কল্প বা যুগ নির্ণয় করেছেন। 'সূর্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের পূর্ণ আবর্তনকালের সর্বনিম্ন গুণিতক পূর্ণ সংখ্যা (integral multiple) এই কল্প বা যুগের পরিমাণ।' সূর্যসিদ্ধান্তের জ্যোতিষীয় গণনা এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বরাহমিহির তাঁর 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় পৈতামহ, বাশিষ্ঠ, পৌলিশ, রোমক ও সূর্যসিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তে রাশির বিবরণ ও লগ্নের আলোচনা আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩৬৫.২৫৯১ দিনে এক বছর ধরা হয়। পৌলিশ সিদ্ধান্তে সর্বপ্রথম সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কাল নির্ণয় সংক্রান্ত আলোচনা আছে। সূর্যসিদ্ধান্ত আর্যভটের পূর্ববর্তী কালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

আর্যভটের সময়ে ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সুবর্ণ যুগ। তিনি ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আর্যভটীয়'

নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই ভারতীয় জ্যোতির্বিদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘোরে। তিনিই প্রথমে ত্রিকোণমিতির সাইন (sine) আবিষ্কার করেন। পর পর তুদিনের দৈর্ঘ্যের ব্যবধান সঠিক নির্ণয় করবার সূত্র তিনিই নিরূপণ করেন। তিনি আবিষ্কার করেন—

(১) অপদূবকের (apse) সাহায্যে গ্রহের কক্ষ (orbit) নির্ণয়ের বিশুদ্ধ সমীকরণ।

(২) যদিও গ্রহগণ সমভাবে বৃত্তাকারে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাহলেও তাদের গতি অসম বলে মনে হয়, যেহেতু তাদের ভ্রমণবৃত্তের কেন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্র বিভিন্ন।

এখানে উল্লেখযোগ্য তাঁর গণনার সঙ্গে বর্তমানের নির্ভুল গণনার প্রভেদ খুব বেশি নয়।

(৩) ক্রান্তিবৃত্তের কোন এক বিন্দুর প্রকৃত উচ্চপাত ও নিম্নপাত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সমীকরণ।

(৪) চন্দ্রের কক্ষে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তার ব্যাস-কোণের পরিমাণ।

(৫) সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব ও তথ্য।

আর্যভট মনে করতেন প্রতি বছরের দিন সংখ্যা ৩৬৫.২৫৮৬৮০৫। এ গণনা টলেমীর গণনাব চেয়ে অনেক বেশি শুদ্ধ।

আর্যভট চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে প্রচলিত শাস্ত্র-বিরোধী মত প্রচার কবেছেন।

তাঁর জীবিতকালেই বরাহমিহিরের জন্ম হয়। ধূমকেতু সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছেন। লাটদেব, সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন ও বিজয় নন্দী প্রভৃতি জ্যোতির্বিদের নাম স্মরণীয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য নাম 'ব্রহ্মগুপ্ত'। তিনি ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রহের দ্রাঘিমা গণনার সহজ

রীতি আবিষ্কার করেন। তিনি যে সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করে গেছেন সেগুলি হলো—

(১) গ্রহদের আহ্নিকগতির উপর 'মন্দ' ও 'শীঘ্র' এই দুই ধরনের বৈষম্যের প্রভাব।

(২) যে কোন দিনে দঃ পূঃ ও দঃ পঃ উল্লম্বে সূর্যের উন্নতি বা altitude নিরূপণ।

(৩) দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের লম্বন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সমীকরণ।

(৪) দৃক্‌কর্মের বিশুদ্ধতব সমীকরণ নির্ণয়।

(৫) 'বলন' বিষয়ে আগের চেয়ে বেশি নির্ভুল বিবরণ প্রদান।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে মঞ্জুল, শ্রীপতি, ভাস্করাচার্য (সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থ প্রণেতা) উল্লেখযোগ্য।

রসায়ন ঃ আয়ুর্বেদচর্চা যাঁরা করতেন তাঁদেরই একাংশ রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন। চবক ও সুশ্রুত-সংহিতায় সোনা, রূপা, তামা, সীসা, টিন, লোহা এই ছ'রকমের ধাতু, কয়েক ধরনের লবণ ও ক্ষারেব উল্লেখ আছে। ক্ষার তৈরীর প্রণালী, আসব এবং বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়াব কথা জানা যায়। মৌল ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে যে ভেদ আছে সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন। তাঁবা মনে করতেন ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়েছে।

চরকসংহিতায় পাঁচরকমের লবণের কথা বলা হয়েছে। ক্ষার ও ক্ষার-তৈবী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সুশ্রুত-সংহিতায় আছে। 'নাবনীতকে' চক্ষুরোগের জন্য নানাধবনের কাজল তৈরীর ব্যবস্থাপত্র আছে।

বাগভটের রসায়নে 'অন্ধমুষা' নামে এক ধরনের Crucible-এর কথা জানা যায়। বৃন্দ ও চক্রপাণি দত্ত কয়েক ধরনের যৌগিক প্রস্তুতের বর্ণনা করেছেন। তান্ত্রিক কিমিয়ার যুগে নাগার্জুনের নাম

উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'রসরত্নাকরে' পিতল, কৃত্রিম সোরা, পারদ তৈরী ইত্যাদির আলোচনা আছে। স্বেদনী যন্ত্র, পাতন যন্ত্র, অর্ধপাতন যন্ত্র, ঢেঁকি, তির্যকপাতন, বিদ্যাধর, ধূপ ও বালুকাযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

খনি থেকে ধাতু নিষ্কাসন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা বিশুদ্ধিকরণের উপায় হিন্দুরা খ্রীষ্টজন্মের তিনশত বছর আগেই জানতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতকের আগেই ভস্মীকরণ অধঃপাতন, স্বেদন, ঊর্ধ্বপাতন, স্তম্ভন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নশাস্ত্রচর্চা ও গবেষণা সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থে বিশদভাবে লিখে গেছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা : উদ্ভিদের বীজের মধ্যে তার সমস্ত যন্ত্র (Organ) ও তন্তুর (tissue) অংশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্তমান তা জানা যায়। উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীট ও ছত্রাকজনিত পীড়া ও তার লক্ষণ এবং তা উপশমের উপায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিবর্তন যেমন গন্ধহীন ফুলকে সুগন্ধি করা, কার্পাস গাছে নানাধরনের তূলা উৎপাদন করা বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত শার্ঙ্গধর পদ্ধতির অন্তর্গত 'উপবনবিনোদ' খণ্ড উদ্ভিদবিদ্যার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

চিকিৎসাবিদ্যা : শল্যবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা দুই-ই খুব উন্নতিলাভ করে। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রায় ১০১ ধরনের যন্ত্র ও শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। অস্ত্রোপচারের নানা বিবরণ সুশ্রুত সংহিতায় পাওয়া যায়। অন্ত্র পরীক্ষা, প্রস্তর নিষ্কাসন (extraction of stone), মস্তকের অস্থি অপসারণ (trephining) প্রভৃতি বড় বড় অস্ত্রোপচারের উল্লেখ সুশ্রুত ও বাগভটের গ্রন্থে আছে।

শারীরবৃত্ত ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল্যবান গবেষণা আছে। বিপাক, সংবহন, রক্তবাহ, নার্ভের ক্রিয়া, ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, বংশগতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা তাঁরা করেছেন। হাসপাতাল, পশুচিকিৎসালয় স্থাপন প্রাচীন হিন্দুদের অন্যতম কীর্তি।

ধাতুবিদ্যা ঃ সোনা, রূপা, লোহাকে বলা হতো খাঁটি ধাতু। সীসা ও টিনকে 'পূতিলোহ'। সংকর ধাতু ছিল তিন ধরনের— পিতল, কাঁসা, বর্তলোহ।

প্রতিটির নানা শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। ব্ল্যাষ্টফার্ণেসের সাহায্যে ইস্পাত তৈরী, আকর থেকে তামা, দস্তা নিষ্কাসনেব সুন্দর বিবরণ আছে। পতঞ্জলি হলেন ভারতীয় ধাতুবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা।

কারিগরিবিদ্যা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ প্রাচীন ভারতে যে-সব কারিগরিবিদ্যা অধীত হতো তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই প্রযুক্তি-বিদ্যায় ভারতের অগ্রগতি সম্বন্ধে বোঝা যাবে।

১. ধাত্বাদিনাং সংযোগ-অপূর্ব-বিজ্ঞানম্—নতুন ধরনের ধাতব যৌগিক প্রস্তুত বিদ্যা।

২. তটাক-বাপি-প্রসাদ-সমভূমি-ক্রিয়া—পুকুর, কূপ কাটানো, জমি সমতল করা ইত্যাদি।

৩. উপকরণ ক্রিয়া, যন্ত্রপ্রয়োগ বা যন্ত্রমাতৃকা—যন্ত্রবিদ্যা।

৪. নৌকা-রথাদি কৃতিজ্ঞানম্—নৌকা-রথ, ও অন্যান্য যানবাহন তৈরী করার বিদ্যা।

৫. কৃত্রিম-স্বর্ণ-রত্নাদি-ক্রিয়া জ্ঞানম্—কৃত্রিম সোনা ও রত্নসমূহ প্রস্তুত বিদ্যা।

৬. কাচ-পাত্রাদি করণ-বিজ্ঞানম্—কাচপাত্র নির্মাণবিদ্যা।

৭. জলানাং সংচেনং সংহরণম—জলসেচ বিদ্যা।

৮. লোহাদিসারশাস্ত্র-অস্ত্র-কৃতিজ্ঞানম্—লৌহ-অস্ত্রাদি প্রস্তুত বিদ্যা।

ভারতে তৈরী সমরাস্ত্র (তলোয়ার, ছোরা, তীরের ফলা, বল্লমের ডগা) বিদেশেও আদৃত হতো।

দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তম্ভ প্রাচীন হিন্দুদের ধাতু-বিদ্যা ও কারিগরি শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক।

বিবর্তনতত্ত্ব: কপিলের সাংখ্যদর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনাবলীতে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে শ্রদ্ধার সংগে উচ্চার্য 'পতঞ্জলি'র নাম। যেমন ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, তেমনি প্রাণীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন।

পদার্থবিদ্যা: পরমাণু বিজ্ঞানে কণাদের নাম প্রথমেই মনে আসবে। সমস্ত পদার্থ যে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি তা তিনি জানতেন। বায়ু তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শব্দের প্রসারণ হয়, আলো ও তাপ একই শক্তির বিভিন্ন রূপ, এই সব তত্ত্ব কণাদ প্রায় দু'হাজার বছর আগে বলে গেছেন। ভারতের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থের চীন দেশীয় ভাষায় অনূদিত (মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না) একটি গল্প থেকে জানা যায় যে প্রাচীন হিন্দুরা আর্কিমিডিস যে সূত্র আবিষ্কার ক'রে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই সূত্র অনেক আগেই স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। আর একটি প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীতে প্যারাসুটের অন্তর্নিহিত তথ্যের কথা আছে।

জৈন, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভাস্করাচার্য লিখেছেন যে পৃথিবী অন্তরীক্ষের যাবতীয় বস্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তাঁর এই বক্তব্য নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে মনে করিয়ে দেয়। শক্তির নিত্যতা, পরিবর্তন, অপব্যয় এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব হিন্দুরা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে আবিষ্কার করেন। শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদ্দ্যোতাকার শবরস্বামী অনেক মূল্যবান

তথ্য দিয়েছেন। একই সঙ্গে বাৎস্যায়ন, বাচস্পতি, শার্ঙ্গদেবের ও প্রস্থপদের নাম উল্লেখযোগ্য।

বরাহমিহির শিলাদারণ (searing of hard rock), শস্ত্রপান (hardening of steel), বজ্রলেপ (preparation of cement) প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। ভারতে কাচ তৈরী হতো এবং তা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

পদার্থবিদ্যার কতকগুলি প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে—

১. আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা।

২. আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়া।

৩. লেনসের মূল নীতি।

৪. তারের কম্পন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

৫. চৌম্বক আকর্ষণ।

৬. পদার্থের গতি।

সমুদ্রযাত্রী জাহাজে দিক্ নির্ণয়ের জন্য 'মৎস্য-যন্ত্র' ব্যবহৃত হতো। এই যন্ত্র তৈলপূর্ণ পাত্রে রাখা হতো আর তা সকল সময়ে উত্তর দিক নির্দেশ করতো। তড়িৎ বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলি উমাস্বতী (৫০ খ্রীঃ) বলে গেছেন।

আবহ-বিজ্ঞান ঃ জীবনধারণের জন্য 'খাদ্য' অবশ্য প্রয়োজনীয়। এবং বৃষ্টির উপর নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন। এজন্য প্রাচীন হিন্দুরা বৃষ্টিপাতের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। বরাহমিহির এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বক্তব্যে গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বৎস প্রভৃতি পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ আছে। বৃষ্টি-জলের পরিমাণ মাপার যন্ত্র (rain-gauge) হিন্দুরা আবিষ্কার করেছিলেন। কোন্ দেশে কেমন বৃষ্টিপাত হয় তার বিবরণ রাখা হতো।

প্রাণিবিদ্যা ঃ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উমাস্বাতী জীব-জন্তুর যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন তাতে বোঝা যায় সেকালে এ বিষয়ে খুব চর্চা হতো। কিন্তু তার ইতিহাস ভালভাবে জানা যায়নি। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আধুনিককালে খুব বেশি অনুসন্ধান হয়েছে বলে মনে হয় না।

ভূবিদ্যা ঃ সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথিবীর পরিবর্তন সাধিত হয় এ তত্ত্ব হিন্দুদের জানা ছিল। ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের গবেষণা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর—তার আভাস ধাতুবিজ্ঞান ও রসায়ন অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক ও বেদোত্তর ভারতবর্ষের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো। গুপ্ত ও উত্তর-গুপ্তযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে বিজ্ঞানচর্চার গতি তীব্র হয়ে ওঠে। গুপ্তযুগের প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ। আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদেরা এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নাগার্জুন, বাগভট, নাবনীতকের রচয়িতা, মাধবকর, বৃন্দ, প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যার মান আরো উন্নত হয়। ক্রমে বিজ্ঞান-চর্চার ধারা ক্ষীণতর হতে থাকে। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা সুরু হলো। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পর বিজ্ঞানের জগতে ভারতীয়দের দানের কথা আর শোনা যায় না।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কেন এই যবনিকাপতন হলো তার কারণ বের করা সহজ নয়। তবে এই সময়ে রাজনৈতিক গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা লেগেই ছিল। বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতভূমির শান্তি প্রায়ই বিঘ্নিত করত। অবশেষে বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হলো। ধর্মের অনুশাসন প্রবল হয়ে উঠল।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ, গ্রাম-শিরোমণিরা, সমাজপতিরা ধর্মকে কুসংস্কার দিয়ে বেঁধে জনসাধারণের উপর চাপাতে লাগলেন। কারিগরি-বিদ্যার অমর্যাদা হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এসে পর্যুদস্ত করে ফেললো বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহকে।

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন কুণ্ঠাহীন চিত্তে। অনেকে প্রচলিত মতবাদ, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে পর্যন্ত অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। অথচ তাঁরা কেউ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হননি, সমাজচ্যুত হননি, বরং সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্মান নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা এত উদার ছিলেন (যা আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে বর্তমান) যে এখানে নিজস্ব মত প্রকাশের জন্য গ্যালিলিওর মত নির্বাসনে থাকতে হয়নি, সক্রেটিসের মত বিষ খেয়ে মরতে হয়নি, ব্রুনোর মত পুড়ে আত্মবিসর্জন দিতে হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যেমন জানতেন, তেমনি তৎকালীন 'নব্য-বিজ্ঞানের' যাবতীয় তথ্য সাগ্রহে সংগ্রহ করতেন। এই দুইয়ের সঙ্গে মিশেছিল তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির আলোকধারা।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-কংগ্রেস

[বৈজ্ঞানিক সম্মেলন]

ভারতে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জন্ম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু একথা বললে সঠিক হবে না যে তার আগে কোন সময়ে ভারতে এ জাতীয় অধিবেশন বসেনি। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যখন প্রদীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত, তখন পাশ্চাত্যখণ্ড অজ্ঞানতার গাঢ়

সুষুপ্তিতে মগ্ন। খ্রীষ্টের জন্মের সেই বহু শত বছর আগেও আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনও বসত, তর্ক হতো বিস্তর, নানা তর্কের মীমাংসাও হতো। চরক জন্মেছিলেন বুদ্ধদেবের আগে, সুশ্রুত তার আগে। সুশ্রুতের আগে অথর্ববেদ, তারও আগে ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদেও বিজ্ঞানের নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হতেন নির্দিষ্ট স্থানে। আজকাল তাকেই বিজ্ঞান-কংগ্রেস বলা হয়ে থাকে। অধুনা বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুরোধার কাজ অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি করে থাকেন। সেকালেও রাজা-মহারাজারা ঐ সব কংগ্রেসের অধিবেশনে পুরোধার কাজ করতেন।

চরকের তখনও আবির্ভাব হয়নি। সে সময় এক বিজ্ঞান সম্মেলনে কাশীরাজ ছিলেন পুরোধা। কাশীরাজ নিজেও ছিলেন বিজ্ঞানের সাধক। তাঁর নাম ছিল বামক ঋষি। কাশীরাজের মত আরো অনেক নরপতি বিজ্ঞানচর্চা করতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন পুঁথিপত্রে। অধিবেশন কোথায় হয়েছিল সঠিক জানা যায়নি। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি কোন উপবনে বা প্রাসাদেই কোথাও হয়েছিল অনুমান করা চলে।

সমবেত হয়েছিলেন বহু ঋষি। প্রত্যক্ষধর্মা, পুনর্বসু, পারিক্ষি মৌদ্গল্য, শরলোমা, রাজর্ষি বার্যোবিদ, হিরণ্যাক্ষ, শৌনক, ভদ্রকাপ্য, ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন, আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহাঋষিরা সমবেত। পুনর্বসু প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

সভা শুরু হলো। কাশীরাজ উদ্বোধন করে ঋষিদের অভিবাদন জানিয়ে প্রশ্ন তুললেন—'ভগবন্! আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমষ্টিরূপ হচ্ছে 'পুরুষ'। পুরুষ যা থেকে জন্মেছে, রোগও কি তা থেকেই জন্মেছে?' সভাপতি পুনর্বসু উঠে সকলকে

যথোপযুক্ত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন 'সমবেত ঋষিগণ, আপনারা প্রত্যেকেই অমিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিকারী। আপনারা বিচার করুন।'

আরম্ভ হলো আলোচনা। মৌদ্গল্য 'আত্মা' সম্বন্ধে কিছু বলে সিদ্ধান্তে এলেন যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, অতএব আত্মা কর্ম করেন ও তার ফল ভোগ করেন। কাজেই 'পুরুষ' জাত হয়েছে আত্মা থেকে এবং রোগের সৃষ্টিও সেই থেকে।

ঋষি শরলোমা প্রতিবাদ করলেন। বললেন—আত্মা তো শীতোষ্ণ দুঃখ বিরহিত। আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কোন কর্ম করেন না। তাই তিনি ফল ভোগের অধিকারী নন্। বলা যেতে পারে 'রজ এবং তমোগুণাক্রান্ত সত্ত্বসংজ্ঞক মন' দেহ ও রোগের উৎসস্থল।

ঋষি বার্যোবিদ (বায়ুর বিশেষজ্ঞ?) আপত্তি তুললেন। বললেন, শরীর ছাড়া কোন রোগই হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে জল-ই হচ্ছে পুরুষের রোগের কারণ, কারণ স্বরূপ তিনি বললেন জল থেকে রসোৎপাদন হয় এবং ঐ রস থেকে ভূতাদি ও রোগের সৃষ্টি।

'হিরণ্যাক্ষ' পৃথক অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন আত্মা রসের উৎপত্তি স্থল হতে পারে না। রস থেকে অতীন্দ্রিয় মনের জন্মলাভ সম্ভব নয়। আত্মার সঙ্গে পঞ্চভূত মিলিত হলেই পুরুষ বা রোগের জন্ম হতে পারে এ কথা তিনি বললেন।

'শৌনক' প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'বাবা-মা ছাড়া ষটধাতুজ পুরুষও সম্ভব নয় এবং রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে না।'

'ভদ্রকাপ্য' শ্লেষ করে বলে উঠলেন, 'তা হলে অন্ধের ছেলেও অন্ধ হবে কি? তা নয়। বাবা-মা কিছুই নয়, আসলে কর্ম-ই সব। কর্ম থেকে পুরুষ জন্মেছে এবং রোগের কারণও হলো কর্ম।'

মহাঋষি ভরদ্বাজ তখন বললেন, 'কর্তা ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদন

করা সম্ভব নয়। স্বভাবই হচ্ছে পুরুষ ও রোগের উৎপত্তির কারণ।'

'কাঙ্কায়ন' আপত্তি তুললেন। তিনি জানালেন, সমস্ত চেতন-অচেতন জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই 'প্রজাপতি' (ব্রহ্মসূত) পুরুষ ও রোগের সৃষ্টিকারী।

ভিক্ষু 'আত্রেয়' প্রতিবাদ করে বললেন, 'এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে না। কারণ প্রজাপতি তাঁর সমস্ত প্রজাপুঞ্জের হিতকামী কাজেই রোগ সৃষ্টি তিনি করতে পারেন না। সব কিছুই কালকৃত। যেহেতু সমগ্র জগৎ কালের বশীভূত।'

ভিক্ষু আত্রেয় মতামত অনেকটা মহামুনি ভরদ্বাজের মতানুযায়ী। 'বাদসংঘট্ট' [আধুনিক ভাষায় বক্তৃতা, যুক্তি আর মতানৈক্য,] চলতে লাগলো। এবার সভাপতি পুনর্বসু ভাবিত হয়ে সগম্ভীরে বললেন, 'আপনারা অনর্থক বাদ-প্রতিবাদ করছেন। অধ্যাত্মমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে।'

আত্রেয় মুনি বললেন, 'ষটধাতু ইত্যাদি ভাবের যদি সদ্ভাব হয় তাহলে মানুষের জন্ম হয় এবং অসদ্ভাব হলে মানুষের নানা রোগ হয়।'

আত্রেয় মুনির এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভরদ্বাজ মুনির বক্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। যাই হোক এই বিজ্ঞান-কংগ্রেসে মানুষের ও রোগের জন্ম কারণের এই বক্তব্য গৃহীত হলো। তাহলেও মূল প্রশ্ন রয়ে গেল। কাশীরাজ আবার প্রশ্ন করলেন, 'পুরুষের এবং রোগের অভিবৃদ্ধির কারণ কি ?'

আত্রেয় বললেন, 'হিতাহার (পরিমিত এবং প্রয়োজনীয় আহার) পুরুষের অভিবৃদ্ধির কারণ এবং অ-হিতাহার রোগের।'

ঋষি অগ্নিবেশ হিতাহার ও অহিতাহারের সূত্র অনুসরণ করে এক বিরাট আলোচনার সূত্রপাত করলেন। তা 'অগ্নিবেশ তন্ত্র' নামে বিখ্যাত। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এই তন্ত্রটিও গৃহীত হলো। এই 'অগ্নিবেশ তন্ত্র'কে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল চরকসংহিতা।

এখান থেকে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রাচীনকালে 'জ্ঞেয়' বিষয়কে জানবার নিশ্চিত পন্থা বলে স্বীকার করা হতো অধ্যাত্মসাধনাকে।

এর অনেক আগে আরো একটি বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা জানা যায়। এই অধিবেশন হিমালয় পর্বতের পাশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন এই অধিবেশন? কারণ—

'বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাং। তপোপবাসাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাং॥ তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ। সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥[১]

যখন পৃথিবীতে রোগ দেখা দিল, রোগ প্রাদুর্ভূত হয়ে মানুষের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও আয়ুর বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগল তখন পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণ কেমন করে রোগবিমুক্ত হওয়া যায় এই দুরূহ জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য হিমালয়ের পাশে সমবেত হয়েছিলেন।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম—[২]

'অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপো ভৃগুঃ। আত্রেয়ো গৌতমঃ সাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ॥

অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্বলায়নৌ। পারিক্ষির্ভিক্ষুরাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ॥

বিশ্বামিত্রাশ্বরথ্যৌ চ ভার্গবশ্চ্যবনোঽভিজিৎ। গার্গ্যঃ শাণ্ডিল্য-কৌণ্ডিল্যৌ বার্ক্ষির্দ্দেবলগালবৌ॥

সাঙ্কৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকো বাদরায়ণঃ। বড়িশঃ শরলোমা চ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ॥

১ চরকসার: কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাঃ ১ম সং ১৩১১ বাং, পৃঃ ২

২ চরকসার (চরকসংহিতা), সূত্রস্থান পৃঃ ৩

কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়ো-ধৌম্যো মারীচিকাশ্যপৌ। শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেব চ॥

শৌনকঃ শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়মৈমতায়নিঃ। বৈখানসা বালখিল্যাস্তথা চান্যে মহর্ষয়ঃ॥

ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্য নিয়মস্য চ। তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ॥

কেমন করে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, কিভাবে রোগের উৎপাত নিবারণ করা সম্ভব—সর্বভূতে কৃপাপরতন্ত্র হয়ে মহর্ষিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে এসেছিলেন। সেই সভায় অঙ্গিরা, যমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সাংখ্য, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, আশ্বলায়ন, পারীক্ষি, ভিক্ষু আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কপিঞ্জল, বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজবাপী, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কৈকশেয়, ধৌম্য, কাশ্যপ, মারীচি, শর্করাক্ষ, লোকাক্ষ, পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, মৈমতায়নি, বৈখানস (যাঁরা পরিণত বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন), বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, দম ও নিয়মের নিধিস্বরূপ এবং তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির মতো দেদীপ্যমান।

বিবরণ দেখে মনে হয় মহর্ষি ভরদ্বাজ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। অধিবেশনে প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো তা হচ্ছে—

'ধর্মার্থকাম মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগস্তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্॥'[৩]

---

৩ চরকসংহিতা

অর্থাৎ আরোগ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কারণ। পরন্তু রোগ সেই চতুবর্গের (সাধনা) ও জীবনের অপহর্তা। এই রোগ প্রাদুর্ভূত হয়ে মানুষের ভীষণ অন্তরায় হয়েছে।

আলোচনান্তে স্থিব হলো ধ্যানচক্ষুতে পথনির্দেশ লাভ কবতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেববাজ ইন্দ্রের কাছে যাওয়া সাব্যস্ত হলো। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের শরণাগত হয়ে আয়ু বৃদ্ধিব শাস্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিখে ফিবে আসেন। পুনর্বসু এবং আরো কয়েকজন দীর্ঘজীবনলাভেচ্ছু ঋষি ভবদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ কবেন। পুনর্বসুর ছয় শিষ্য—অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ পরাশর, হাবীত ও ক্ষারপাণি আয়ুর্বেদ শিখলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের নামে তন্ত্র রচনা করলেন! প্রথমে কবলেন অগ্নিবেশ। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

আবার কংগ্রেসেব অধিবেশন। অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, হারীত, ক্ষারপাণি তাঁদের বক্তব্য পেশ কবলেন। ভবদ্বাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের 'সামান্য', বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায় ইত্যাদিব ব্যাখ্যা করলেন।

এই সম্মেলনের পবও বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশনের কথা জানা যায় চরকসংহিতায়। ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, পুনর্বসু বার্যোবিদ ছাড়া শাকুন্তেয় ব্রাহ্মণ, মৌদ্গল্য পূর্ণাক্ষ, কৌশিক, কুমারশিবা, রাজা বৈদেহ নিমি, মহামতি বড়িশ, কাঙ্কায়ণ বাহ্লীক ও বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক ইত্যাদি। 'চৈত্রবথ বনে' অধিবেশন হয়। এবারে আলোচ্য বিষয় রসের প্রকরণ। কার্য, শক্তি, আশ্রয়, গুণ ইত্যাদির ভেদ নির্ণয় করা ও তা দিয়ে 'আহার বিষয়'* নিশ্চিতকরণ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তখন রসায়ন শাস্ত্র জন্ম নিয়েছে এবং শারীর বিদ্যার (physiology) ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

* প্রাচীনকালে 'আহার' শব্দে 'আহরণও' বোঝাতো

ভদ্রকাপ্য বললেন—রস এক প্রকার। জিহ্বাদ্বারা গ্রাহ্য এবং জলের সঙ্গে অভিন্ন।

শাকুন্তেয় ব্রাহ্মণ বলেন—রস দুই শ্রেণীর। ছেদনীয় ও উপশমনীয়।

মৌদ্গল্য পূর্ণাক্ষ—রস তিন প্রকাব। ছেদনীয়, উপশমনীয় ও সাধারণ।

হিরণ্যাক্ষ ও কৌশিকী—রস চার প্রকার। হিত স্বাদু ও অস্বাদু, অহিত স্বাদু ও অস্বাদু।

কুমারশিরা ও ভরদ্বাজ—রস পাঁচ প্রকার। ভৌম, ঔদক, আগ্নেয়, বায়ব্য ও অন্তরীক্ষ।

বার্যোবিদ—রস ছয় প্রকার। গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ।

বৈদেহ নিমিরাজা—রস সাত রকমের। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় ও ক্ষার।

বড়িশ ধামার্গব—ঐ সাতটি রসের সঙ্গে আর একটি সংযোগ করলেন। তার নাম 'অব্যক্ত'।

বাহ্লীক কাঙ্কায়ণ ও বৈদ্যবাহ্লীক—রস অসংখ্য, যেহেতু তার আশ্রয়, গুণ, কর্ম ও সংস্কার অসংখ্য।

সভাপতি আত্রেয় পুনর্বসু সমস্ত বক্তব্যকে সামগ্রিক রূপ দিলেন

রস ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়। এদের উৎপত্তিস্থল হলো জল।

রসের কার্য—দুই। ছেদ ও উপশম। উভয়ের মিশ্রণভাবই 'সাধারণত্ব'।

রসের শক্তি—দুই প্রকার। হিত ও অহিতজনক।

রসের আশ্রয়স্থল—পঞ্চমহাভূত (ক্ষিত্যাদি...)। প্রকৃতি, বিকৃতি, বিচার, দেশ ও কাল অনুসারে রসের আশ্রয়দ্রব্যগুলিতে গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতি গুণ জন্মে। ক্ষার হচ্ছে দ্রব্য। দ্রব্য, দেশ, কালপ্রবাহের জন্য রসের তেষট্টি রকমের ভেদ কল্পিত

হয়েছে। এই তেষট্টি ধরনের রস এবং অনুরসের তরতমাদি ভেদে রস অসংখ্য রকমের।

শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র রায় এসম্বন্ধে যা সংগ্রহ করেছেন তা তুলে ধরছি।

'গুরু লঘু ইত্যাদি ব্যতীত রসের আরও পরাপরত্ব দশটি গুণ আছে, যথা—পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিয়োগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস। ভৌম দ্রব্যগুলি গুরু, খর, কঠিন, মন্দ, স্থির, বিষদ, সান্দ্র, স্থূল, ও গন্ধবহুল। ইহারা দেহের উপচয়, কাঠিন্য, গুরুতা ও স্থিরতা সম্পাদক। ঔদকদ্রব্যগুলি, দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, মন্দ, সর, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল ও রসবহুল। ইহারা দেহের উৎক্লেদ, স্নেহ, বন্ধ, অভিষ্যন্দিতা এবং প্রহ্লাদকারিতার কারক। আগ্নেয় দ্রব্যগুলি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, লঘু, রুক্ষ, বিষদ এবং রূপগুণ-বহুল। ইহারা দেহের রুক্ষতা, গ্লানি, বিচার বা গতি, বিষদতা এবং লঘুতা সম্পাদক। আন্তরীক্ষ দ্রব্যগুলি মৃদু, লঘু সূক্ষ্ম, শ্লক্ষ্ণ এবং শব্দবহুল। ইহারা দেহের মৃদুতা, ছিদ্রতা ও লঘুতা সম্পাদক।'

সভাপতি আত্রেয় পুনর্বসুর এই ধরনের ভাষণের পর সমাপ্তি ঘোষিত হলো অধিবেশনের।

একথা সহজেই অনুমেয় যে প্রাচীনকালে ঋষিরা বিজ্ঞানচর্চা করতেন। তাঁরা কেবলমাত্র অধ্যাত্মজগৎ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন না। শুধু তাই নয়, জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সম্মিলিত হতেন। তাতে বাক্-বিতণ্ডা হতো। প্রত্যেকেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই হচ্ছে ডেমোক্রেসি বা ডেমোক্রেটিক পন্থা। দেশের দূর-দূরান্তর থেকে কৌতূহলী সাধকেরা সমবেত হতেন দৈহিক শ্রম, পথের কষ্টকে উপেক্ষা করেও। বিজ্ঞানীর ধর্মও তাই। সাধনার শীর্ষে উপনীত হওয়া অর্থাৎ

সত্যকে আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের সনাতন ধর্ম। হয়ত অধ্যাত্মবোধ বা ধ্যানদৃষ্টির (যাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলা যেতে পারে) উপরে প্রাচীন ঋষিরা প্রাধান্য দিতেন, তাহলেও তাঁদের অনুসন্ধানের পন্থা ছিল পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। ব্রিটিশ লেখকরা প্রাচীনকালে বিজ্ঞানচর্চায় মিশর ও চীনের অবদান স্বীকার করেন, কিন্তু ভারতের কথা উচ্চারণ করতেও যেন কুণ্ঠার শেষ নেই। সত্যকে অস্বীকার করবার এই অবাঞ্ছিত প্রবণতা নিঃসন্দেহে অস্বাস্থ্যকর।*

---

* এই অধ্যায় রচনার কাজে শ্রীযুক্ত নীবোদচন্দ্র রায়ের 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেরও সাহায্য পেয়েছি—লেখক।

অধিকাংশই চরকসংহিতা, চরকসার প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত—লেখক।

বৈজ্ঞানিক মেজাজ

সত্যকে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বৈজ্ঞানিক মনের সহজাত ধর্ম। যিনি কৌতূহলী এবং যুক্তির ও প্রমাণের সাহায্যে যাবতীয় বস্তুকে গ্রহণ করতে তৎপর হন, তিনিই বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী। এই বৈজ্ঞানিক মেজাজের ধরন কি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিগত ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র সভাপতির ভাষণে সার মাইকেল ফষ্টার বলেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারীদের অন্যান্যদের থেকে তিনটি বিশেষ গুণের জন্য পৃথক করা যায়। সেগুলি হলো[১] :

প্রথমতঃ, তাঁর প্রকৃতি (বিজ্ঞানীর) সর্বোপরি তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ের সঙ্গে এক তালে চলবে। যিনি সত্যের অনুসন্ধানী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, সত্যপ্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে একই ধর্ম আচরণ করতে হবে। আমরা যাকে সত্যবাদিতা বলি, তার চেয়ে এটি অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং তা অনেক বেশি খাঁটি।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মন যথেষ্ট সচেতন থাকবে। প্রকৃতি আমাদের কাছে তার অনেক চিহ্ন তুলে ধরছে, তার রহস্যের প্রারম্ভ কথা সে ফিস্ ফিস্ করে বলে চলেছে। বিজ্ঞানী সব সময় লক্ষ্য রাখেন, তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকৃতি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে। যত ছোট, যত মৃদুস্বরের কথা হোক বা কেন তাঁকে তা শুনতে হবে, বুঝতে হবে।

তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং সাহসিকতা। বৈজ্ঞানিক

---

১ Thompson J. A. (Sir)—Introduction to scince (Home univ. Library), 1911, P. 15—16.

মেজাজের আরো ব্যাখ্যা করেছেন সার জন আর্থার টমসন। তিনি বলেছেন[২], 'As a first characteristic of the Scientific

> mood we would rank a passion for facts,.... It is the desire for accuracy of observation and precision of statement.'

যাঁরা অবৈজ্ঞানিক তাঁরা 'প্রায়' বা 'কাছাকাছি' সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মে তা নেই। দুটি জিনিসের মধ্যে বিভেদ থাকলে তা যত সামান্যই হোক না কেন, প্রকৃতি (Nature) তাদের কখনো এক বলবে না। এই প্রসঙ্গে মনে আসবে অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সনের কথা। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানীকে তাঁর বিচারের সময় নিজের সত্তাকে সরিয়ে রাখতে হবে। তাঁকে এমন সব যুক্তির অবতারণা করতে হবে যা অন্যের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, নিজের পক্ষেও তেমনি। প্রমাণিত ঘটনার (সত্য ?) শ্রেণীবিন্যাস, তাদের অনুক্রম চিহ্নিত করা এবং তাদের মর্মার্থ অনুধাবন করা বিজ্ঞানের কাজ। নিজের ধারণার বশীভূত না হয়ে প্রমাণিত ঘটনার থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর আস্থা স্থাপন করবার অভ্যাসকেই বৈজ্ঞানিক মনের ধর্ম বলা যেতে পারে। অধ্যাপক পিয়ার্সনের ভাষায়[৩]:

> 'The scientific man has above all things to strive at self-elimination in his judgments, to prove an argument which is as true for each individual mind as for his own. The

---

২ Thompson J. A (Sir)—Introduction to science (Home univ Library), 1911, P. 15—16.

৩ Pearson, karl, : The Grammer of Science. 2nd Ed. (1900) [New Ed. 1911], P, 6.

classification of facts, the recognition of their sequence and relative significance, is the function of science, and the habit of forming a judgment upon these facts, unbiassed by personal feeling, is characteristic of what may be termed the scientific frame of mind.'

বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীকে কেবলমাত্র সত্যানুসন্ধানের প্রতি একাগ্র হলেই হবে না, তাঁকে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হবে স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী। কৌতূহল-বৃত্তি তাঁর জন্মগত। যুক্তি ছাড়া কোন কিছুকেই মেনে নিতেন না। যেখানে দেখেছেন কুসংস্কার মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেখানেই তিনি তার মূলোচ্ছেদে প্রয়াসী হয়েছেন। চিরন্তন কৌতূহলস্পৃহা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে সত্যানুসন্ধানে। এই বৃত্তির প্রথম প্রকাশ অতি শৈশবে।

তাঁর ছেলেবেলাতে জাতিভেদ প্রথা খুবই প্রবল ছিল সমাজে। বালক নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) কাছে এই প্রথা দুর্বোধ্য মনে হতো। একজন আর একজনের সঙ্গে কেন খাবে না ? ভিন্ন জাতি হলেই বা দোষ কি ? জাতিভেদ না মানলে কি হয় ? আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ে, না মানুষ মরে যায় ? এই সব নানা চিন্তা তাঁকে আলোড়িত করতো। তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন খ্যাতনামা উকিল। তাঁর বৈঠকখানাতে নানা ধর্মের এবং নানা শ্রেণীর লোক আসতেন। তাঁদের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকোর বন্দোবস্ত থাকত। ব্রাহ্মণ কায়স্থের হুঁকো ছোঁবেন না,

আবার কায়স্থ নমঃশূদ্রেরটি ছোঁবেন না, মুসলমানদেব তো কথাই নেই। কোন হিন্দু মুসলমানের হুঁকো মুখে তুলবেন না। তেমনি মুসলমানেরাও। কেন ? এই বিরাট প্রশ্ন বালককে বিব্রত করতো। তিনি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। সত্যই অন্যের হুঁকো থেকে তামাক খেলে তিনি মরে যান কি না। তিনি সব মক্কেলের হুঁকো থেকে ধূম উদ্গীবণ কবলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি তো মরে গেলেন না, বা পৃথিবী তো ঘাড়ে পড়লো না। এমন সময় বিশ্বনাথবাবু এসে পড়লেন। ছেলেকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কচ্ছিস্ রে ?' । ছেলে অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, 'দেখছি, জাত না মানলে কি হয় !' বাবা জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্রর কৌতূহল চবিতার্থ হলো। প্রমাণ পেয়ে বুঝলেন জাতিভেদ প্রথা মিথ্যা। এ সম্পর্কে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা কল্পিত।

ছেলেবেলাতে যেখানেই রামায়ণ গান হতো শুনতে যেতেন। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ অদ্ভুতকর্মা হনুমান তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নরেন্দ্র এই ভক্তপ্রবরের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কথক বললেন হনুমান কলাব বনে (কদলী বন) থাকেন। অমনি নরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন সত্যই কি না। কথক জবাব দিলেন, 'হ্যাঁগো, গিয়ে দেখ না।' প্রমাণ চাই। সে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর মনে হলো বাড়ির কাছেই কয়েকটা কলাব ঝোপ আছে। তিনি তখনই তার মধ্যে গিয়ে একটা কলাগাছের নীচে চোখ বন্ধ ক'রে হনুমানের দর্শন প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু কথকের কথার প্রমাণ পেলেন না। তিনি ক্ষুণ্ণমনে বাড়ি ফিরে গেলেন। সকলে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন 'ওরে বিলে, বোধ হয় আজ হনুমান প্রভুর কাজে অন্য কোথাও গিয়েছেন, তাই তাঁর দেখা পাসনি।' এতেও তিনি খুশি হলেন না বটে। তবে তাঁর বালকচিত্ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছিল।

প্রমাণ না পেয়ে কোন কিছু মেনে নিতে পারেন নি কখনো। তার আর এক সুন্দর কাহিনী আছে। নরেন্দ্রের এক সহপাঠীর বাগানে চাঁপাফুলের গাছ ছিল। যখন কোন কিছু ভাল লাগত না তখন ঐ চাঁপাগাছের ডালে পা বাঁধিয়ে হাত ছেড়ে মাথা নীচু করে ঝুল খেতেন। এমন কি ছুপুর বেলাতেও এরকম করতে তাঁর ভাল লাগত। তিনি চাঁপাফুলও ভালবাসতেন। ফুল পাড়তেনও। একদিন ঐভাবে আছেন, তাঁর সহপাঠীর ঠাকুর্দা নরেন্দ্রের গলা শুনে সেখানে এসে নরেন্দ্রের 'দোছুল্যমান' অবস্থা দেখলেন। তিনি ব্যস্ত-সমস্তভাবে নরেন্দ্রকে গাছ থেকে নামতে বললেন, এবং ভবিষ্যতে ঐ গাছে চড়তে নিষেধ করলেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞসা করলেন, 'কেন, ও গাছটায় চড়লে কি হয়?'

বৃদ্ধ বললেন, 'ও গাছে একটা বেক্ষদত্যি আছে। তার ভয়ানক চেহারা, নিশুতি রাতে সে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়!' নরেন্দ্র আশ্চর্য হয়ে ভূতের কার্যকলাপের কথা ভাবতে লাগলেন। এমনি সময়ে বৃদ্ধ আবাব বললেন, 'আর যারা গাছে চড়ে সে তাদের ঘাড় মট্‌কে দেয়।' নরেন্দ্র মুখে কিছু বললেন না। বৃদ্ধ মনে করলেন ওযুধে ধবেছে। মনে মনে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই নরেন্দ্র আবার আগেকার মূর্তি ধরলেন। তাঁর মধ্যে জেগে উঠল সেই কৌতূহলী বৃত্তি। সত্যকে জানবার বাসনা। সত্যিই ভূত আছে কি না! নরেন্দ্র আবার গাছে উঠলেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মদৈত্য এলে তার গায়ের উপরে মলত্যাগ করবেন। সহপাঠী বললেন, 'না ভাই অমন করিসনি, তা হলে সে তোর ঘাড় মটকাবে।' বন্ধুকে সত্যিই ভীত দেখে নরেন্দ্র হেসে উঠে বললেন, 'তুই ছোঁড়া কি আহাম্মক!' একজন একটা কথা বলে গেল বলেই কি সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকুর্দা বুড়োর ঐ বেহ্মদত্যির কথা সত্যি হ'ত

তা হলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে যাওয়া উচিত ছিল।'* দেখা গেল কিছুই হ'ল না। এগুলি যদিও কাহিনী মাত্র। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ্য করতে হবে একটা বিশেষ ভাব, 'কেউ বলেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে ?'

পরবর্তীকালে গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, এমন কি ঠাকুরের দেহাবসানের সামান্য কিছুদিন আগেও সংশয় জেগেছে—সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ খাঁটি কি না! তাঁর নিজের ধারণা সত্য কিনা! এই সংশয়বৃত্তি বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞানী প্রমাণ না পেয়ে কিছু বিশ্বাস করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বিনা বিচারে অন্ধের মত কোন জিনিস বিশ্বাস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নিবেদিতা যখন তাঁকে নানা প্রশ্ন ক'রে সংশয়ের অবসান ঘটাতে চাইছেন, তখনও তিনি একই কথা বলেছেন। প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস কোরো না। 'আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি'। শেষ জীবনে স্বামীজী বলতেন, 'বইয়ে লেখা আছে অতএব সত্য, এমনভাবে কোন জিনিসকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। অমুক লোক বলিয়াছে অতএব সত্য, এই বলিয়া কোন জিনিসকে হঠাৎ সত্য বলিয়া মানিও না। সত্যটা যে প্রকৃত কি, তাহা নিজে জানিবার চেষ্টা কর।' এই ধর্ম একান্তভাবে বিজ্ঞানীর।

১৮৮৫ সালের ৯ই মে শনিবার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) ঐ একই মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

"নরেন্দ্র—প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন ?

---

* এই কাহিনী প্রমথনাথ বসু রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' (প্রথম ভাগ), [উদ্বোধন, দ্বিতীয় ২য় সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ পৃঃ ৩৭-৩৮] থেকে গৃহীত।

গিরিশ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)—বিশ্বাসই sufficient proof। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত—External world বাহিরে আছে Philosopher কেউ prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি) -তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়ত বলবে ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

[দেবতারা অমর এই কথা পাড়িল]

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র—অমর, past agesতে ছিল প্রুফ চাই।"[৪]

প্রুফ অর্থাৎ প্রমাণ চাই, তা না হলে কোন কিছু বিশ্বাস করবো না। এ ভাব একান্তভাবে বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞানী শোনেন, পড়েন; কিন্তু বিশ্বাস করেন না। এমন কি নিজের সাদা চোখে দেখলেও না। পরীক্ষা ক'রে বুঝতে হবে যা দেখছি তা সত্য কি না! স্বামী বিবেকানন্দ যখন 'বিলে' বা বীরেশ্বর ছিলেন তখন থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর এই মেজাজ। 'নরেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে তার বিকাশ এবং 'বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে তার পূর্ণতা।

---

৪. শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, নবম সং, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০, পৃ ২৩৪।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান

উনবিংশ শতাব্দীর অস্থিরচিত্ত বাংলাদেশে তথা ভারতভূমিতে কয়েকজন মনীষী দিব্যদৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের দিব্যচেতনার সার্চলাইট দিয়ে মোহাচ্ছন্ন জাতির জড়তা নাশ করেছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকেই বাংলা দেশে আসে জন-জাগরণের প্রবল জোয়ার। একথা অনস্বীকার্য যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জাহ্নবীধারায় অবগাহন ক'রে জাতীয়তাবাদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল নবারুণে আলোকিত তরুণ বঙ্গ সন্তানের দল। চপলতা-উচ্ছলতার (অনেকের মতে উচ্ছৃঙ্খলতার) মদিরাপানে মধু-যুগীয় ইয়ং বেঙ্গলের আরক্ত চোখ স্বাজাত্যবোধের নব অনুভূতিতে স্নিগ্ধ হয়ে এল। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের প্রাণে নতুনতর চৈতন্যের সঞ্চার হ'ল।

রামমোহন থেকে যে জাগরণী গানের সূচনা, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে তারই এক রক্তকমল ফুটে উঠল; রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের দৃষ্টির অনুরাগে সিঞ্চিত হয়ে শতদলে তা আত্মপ্রকাশ করলো। পরাধীনতার এবং সহজ বিলাসের আবর্তে মজ্জমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানুষের নির্জীব বিবেকের ঝুঁটি নেড়ে তাদের অস্তমিত চৈতন্যের ম্লানিমা দূর ক'রে পুনর্জাগরিত করতে চেয়েছিলেন যিনি—তিনি চাবুক হাতে নিয়ে জনগণেশের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। একটা প্রকাণ্ড দেশের স্তিমিত বীর্যকে তিনি কর্ম দিয়ে, বাক্যের কশাঘাত দিয়ে সজীব ক'রে তুলেছিলেন; কেবল তাই নয়, অধীনতার তমিস্রায় সুপ্তিমগ্ন জাতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে সকলের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছিলেন। গৈরিক বসনে রঞ্জিত

আবরণের অন্তরালে যে মানুষটিকে একদিন শিকাগোর ধর্মমহা-সম্মেলনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ক'রে জগৎ মাতিয়ে দিতে দেখা গিয়েছিল তিনি দার্শনিক ও মানবদরদী তো বটেনই, উপরন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক।

তিনি কেবলমাত্র অধ্যাত্মজগতের বাসিন্দা ছিলেন না, তৎকালীন অন্যান্য সন্ন্যাসীর মতো তিনি বিজ্ঞানের বিরোধিতা তো করেনই নি, বরং তিনি ছিলেন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মেজাজের। এক দুর্লভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি অধ্যাত্ম-জগতের মান। তত্ত্ব কুসংস্কারের জটাজাল থেকে বিমুক্ত ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তুলতে পেরেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে রেনেসাঁ এসেছিল তার প্রধান কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব এদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে প্লাবিত ক'রে ফেলেছিল। সেই তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন—জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখেরা।

বিজ্ঞান মানুষকে দেয় বিচারের ক্ষমতা, এনে দেয় জ্ঞানচক্ষু। এর অভাবে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি হয়নি স্বচ্ছ। আমাদের দেশে একটি কথা প্রবাদের মত চলে আসছে--তা হচ্ছে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ। ধর্ম সম্বন্ধে তো কথাই নেই। মঠে, আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রতি অধিকাংশই উন্নাসিকতা প্রকাশ করে। এর প্রাবল্যে তাঁদের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে করুণা প্রকাশ করতেও দ্বিধা বোধ করি না। বিবেকানন্দ-ই সর্বপ্রথম যিনি ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যান।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটলেও একথা সত্য যে প্রতি বিষয়কে বিশেষভাবে জানার নামই বিজ্ঞান। এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি মানুষকে বৃহত্তর ও মহত্তর কার্যে অনুপ্রেরণা দেয়। স্বামী

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কোনক্রমেই অবৈজ্ঞানিক ছিল না তা তাঁর ভাষণ ও লিখিত গ্রন্থাবলী প্রমাণ করে।

কৈশোরেই বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, যদিও স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হ'ত না বললেই চলে। অতি শৈশবে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি বিরাগ থাকলেও কলেজীয় জীবনে সেই বিরাগ পরিণত হ'ল অনুরাগে। কলেজে পাঠকালীন সময়ে গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব ক'রে তা অনুশীলন করেছেন নিজের খেয়ালে, নিজের আনন্দবিধানের জন্য। এ বিষয়ে স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার প্রমথনাথ বসু লিখেছেন[১] ;

> কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্রনাথ যে-সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অন্যতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'Godfrey's Astronomy' নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে যখন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন পরিব্রাজক-রূপে, তখন নানাস্থানে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করেছেন বৈজ্ঞানিকের মত। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলে যে বিশেষ মুন্সীয়ানার প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন তার প্রমাণ এদেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কথা বলা বা দর্শনের জটিল তত্ত্ব বিজ্ঞানের সূত্রের সাহায্যে অথবা উপমার সহায়তায় বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য নয়।

---

১. প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথমভাগ), পৃঃ ৬৫।

বিষয় বস্তুর উপর বিশেষ অধিকার জন্মালে তবেই তা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের চিত্তের তৃপ্তির জন্য আস্বাদন করেছিলেন বিজ্ঞানের রসসমুদ্র। নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী। তারপর তা ছড়িয়ে দিয়েছেন কথায়, লেখায় ও কর্মে।

খেতড়ি রাজ্যের মহারাজার[১] সংগে (স্বামীজীর শিষ্য) 'নিয়ম' বা 'Law' সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সংগে সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ ঐক্য আছে। সেখানে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই আলোচিত হ'ত। স্বামীজী মহারাজকে বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন এবং সজোরে অভিমত প্রকাশ করতেন যে এদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও তত্ত্ব সংগ্রহের বহুল প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। শুধু অভিমত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি। মহারাজের জন্য কয়েকখানি সরল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ (Science Primer) এবং যন্ত্রাদি এনে নিজে তাঁকে কিছুদিন শিক্ষা দেন। পরে নিয়মমত শেখানোর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৯২ সালের অক্টোবরে বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাঁওতে (অধুনা মহীশূর প্রান্তে) থাকাকালীন যাঁরা স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা তাঁর জড় বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং উচ্চগণিতে অসাধারণ অধিকার দেখে বিস্মিত হতেন। ধর্মসম্পর্কীয় জটিল প্রশ্নের সমাধান করতেন বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণের সাহায্যে। বেলগাঁওএর তদানীন্তন ফরেষ্ট অফিসার হরিপদ মিত্র বলেছেন[২]—

'আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—

---

১. অজিত সিং

২. হরিপদ মিত্র—'স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন': স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, শতবর্ষ সং।

Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূবিদ্যা), Astronomy (জ্যোতির্বিদ্যা), Mixed Mathematics (মিশ্রগণিত) প্রভৃতিতে তাঁহার (স্বামীজীর) বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুইচারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্মও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।'

শুধু তাই নয় কলেজীয় জীবনে প্যাথলজি এবং জু'লজির নানা গ্রন্থ সাগ্রহে পড়তেন[৩]। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি নিয়ে তিনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করতেন তাতে তাঁরাও যথেষ্ট বিস্মিত হতেন এমন অনেক নিদর্শন আছে। মহীশূর রাজসভাতে এক তড়িৎ বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি ঐ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের প্রগাঢ়তা দেখিয়েছেন। বিদেশে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে নানা আলোচনায় অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞান প্রীতি যে তাঁর নিছক সখের ছিল না তার প্রমাণ তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মসাধনা। বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে বেদান্ত আর ব্রহ্মচর্যকে একসূত্রে গেঁথে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন:

'আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই

---

৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত- শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড।

technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।'[৪]

শিক্ষাব্যবস্থার যে ধারা তৎকালীন ভারতবর্ষে চলে আসছিল তিনি তার বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে নতুন শক্তিসঞ্চার করা প্রয়োজন তা তিনি অনুভব করেছিলেন। বলেছেন, 'পণ্ডিত-মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা ক'রে বসেছেন।' তাই তিনি নতুন পথের নিশানা দিলেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের কথার জবাবে তিনি বললেন,

ঃ এখন তোদের কি করতে হবে জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর্। কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ কর্। একটা ক'রে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলা-কৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ specialist সন্ন্যাসী থাকবে।[৫]

এই প্রসঙ্গে টাটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মহান প্রতিষ্ঠাতা সার জামসেদজী টাটার একটি চিঠি তুলে ধরবো। ১৮৯৩ সালে জাপান থেকে শিকাগো যাবার পথে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীর সার জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়েছিল। তখন উভয়ের মধ্যে ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং

৪. প্রিয়নাথ সিংহ : স্বামীজীর স্মৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং, নবম খণ্ড।

৫. ঐ ঐ

স্বামীজীর বক্তব্য জামসেদজীকে মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

'সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় ক'রে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে। এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' *

স্বামীজী ভারতে ফিরে এলে ১৮৯৮ সালের ২৩শে নভেম্বর জামসেদজী টাটা স্বামীজীকে এই চিঠিখানা লেখেন—[৬]

'প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,

আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন বা শুনেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। আমার বিবেচনায়, যদি ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা আশ্রম জাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগ ও ধর্মাদর্শের উৎকৃষ্টতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্ম-সমরের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা

* মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর যে চিঠির কথা বলেছেন সে পত্র স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে নেই—লেখক।

৬. বিশ্ববিবেক: পৃষ্ঠা ১৪০ ১৪১।

ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর এই অভিযানে বিবেকানন্দের অপেক্ষা বড় নায়ক কে হবেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় সুরুতে এ ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য অগ্নিময় বাণী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভাল করবেন।

প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমার।

২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮ শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় স্বামী

এসপ্ল্যানেড হাউস, বোম্বাই আপনার বিশ্বস্ত

জামসেদজী এন. টাটা

স্বামীজী এই চিঠির কি জবাব দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। তবে এ চিঠির মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে স্বামীজীর গভীর আগ্রহ অনেকের কাছেই সুবিদিত ছিল। ভারতে শিল্প ও বিজ্ঞানের অধোগতিকে এদেশের পতনের অন্যতম কারণ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। জামসেদজী টাটা আত্মত্যাগী যুবকদের বিজ্ঞানসাধনায় ব্রতী হবার জন্য যে প্রস্তাব স্বামীজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্বামীজীর ভাবধারার অনুসারেই—পত্রলেখক তাঁর চিঠির প্রথম দিকে তা স্বীকারও করেছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞান উভয়কেই যে তিনি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করতেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অধিকতর স্থান দিয়েছে, অনেক বেশি মূল্য দিয়েছে; যেমন প্রাচীনকালে একে অনেক নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে। আজ মানবসমাজের কল্যাণের

দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক আগেই তা ভেবেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর[ক] বক্তব্য তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। তাঁর ভাষায়[৭]—

> 'There is need to-day to view Science in its proper perspective--the perspective of total human knowledge and welfare. This is one of the several vital contributions of Swami Vivekananda to modern thought'.

ক. রামকৃষ্ণমিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারেব সাধারণ সম্পাদক।

৭. Swami Ranganathananda : Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion. P.10.

কারিগরি-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

বিজ্ঞান না জানলে জীবনের অনেক কিছুই থেকে যায় অজ্ঞাত। কেবলমাত্র 'ধর্ম' নিয়ে থাকলে বা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ স্থাপিত না হলে সেই 'ধর্ম' মানুষকে বলিষ্ঠ পথের হদিশ দিতে পারে না একথা স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। তাই 'ঘণ্টা নাড়া'র বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ বরাবর হয়েছে সোচ্চার। তিনি অনুভব করেছেন যে বিজ্ঞানচর্চার অভাবে আমাদের দেশের মানুষের প্রাণ-স্পন্দন যেন থেমে আসতে চাইছে। চারিদিকে কুসংস্কার আর বাজে অনুশাসনের কঠোরতা। তা যেন সমাজের মূলভিত্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল।

শিক্ষা বিষয়ে ভারতবাসীর দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ। বি. এ., এম. এ. পাশ ক'রে ডেপুটিগিরি, কেরাণীগিরি ক'রে জীবন অতিবাহিত করা-ই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এই ধরনের দাসত্ববৃত্তির বিরুদ্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনেক আগে স্বামী বিবেকানন্দ-ই সরবিত্ত হয়ে উঠেছেন। তাই দেখা যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দু'টির দিকেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিরস্কারের ভঙ্গীতে তিনি বলেছেন।[১]

> 'তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরাণীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো!
>
> এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য

---

১. শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী: স্বামী-শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড।

কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি গুখুরি ক'রে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস'।

স্বামীজীর এই বক্তব্যটুকু জানলেই তাঁর শিক্ষানীতির প্রধান ধারা জানা হ'ল। এক ধর্মসঙ্ঘের মধ্যমণি, অথচ কথায় ও কাজে বৈজ্ঞানিকের মত। এহেন সংখ্যা সীমিত। স্বদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থানকালীন সময়েও তিনি প্রতিনিয়ত ভাবছেন স্বদেশেরই কথা। সবাইকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত রাজ্যে নিয়ে আসতে হবে। সেই পথ হবে বিজ্ঞান শিক্ষা। ১৮৯৪ সালে বিদেশ থেকে (আমেরিকা?) গুরুভাইদের কাছে লেখা এক চিঠিতে[২] সেই মনোভাব সুপরিস্ফুট।

ঃ শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ। আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারক-দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটা-কতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু কেমিক্যালস্ (Chemicals) ইত্যাদি চাই, তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই।

---

২. পত্রাবলী: প্রথম ভাগ, পৃ ১২৬।

তারপর তাদের Astronomy, Geography প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদেব যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে। কত গরীব মূর্খ ববানগবে আছে, তাদের ঘবে ঘবে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁতি পাতড়াব কম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।

যাবা অর্থাভাবে স্কুলে-কলেজে গিয়ে শিক্ষা পাচ্ছে না, সেই অগণিত দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত না করলে জাতিব উন্নতির পথ রুদ্ধ। স্বামীজী বলতেন যাবা একেবারেই আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে আসেনি, তাদেব শেখানো উচি• বক্তৃতাব মাধ্যমে। স্কুলে না পাঠিয়ে ববং এভাবে চললেই সুফল পাবাব সম্ভাবনা। কাজ এগোলে—'ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাইবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এই দেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।'

তিনি জানতেন অবৈতনিক বিদ্যালয় করলেই সকলে আসবে না। যেহেতু ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় কাজ করে অন্নবস্ত্রের সংগ্রহ করতে হবে না লেখাপড়াব জন্য সব ছাড়তে হবে? বলা বাহুল্য জীবিকা উপার্জনের পথ ছাড়া চলবে না। তাই তাদের জ্ঞান দেবার জন্য প্রয়োজন একদল কর্মীব, যাবা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে আধুনিক বিজ্ঞানকে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে শিকাগো থেকে লেখা একখানা চিঠির (২৮শে মে, ১৮৯৪) কিয়দংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। সেখানে তিনি বলেছেন শহরের সবচেয়ে গরীবদেব যেখানে বসতি সেখানে মাটির বাড়ী তৈরী করে একটা হল বানাতে হবে। ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ, গ্লোব, রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় করতে হবে। তারপরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গরীব, এমন কি চণ্ডালদেরও জড়ো

ক'রে ধর্মোপদেশ দিতে হবে এবং পরে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে। তাঁর মূল চিঠির অংশটি হ'ল[৩]—

'···Try to get up a fund, buy some magic-lanterns, maps, globes, etc, and some chemicals. Get every evening a crowd of poor and low, even the Pariahs, and lecture to them about religion first and then through the magic lantern and other things, astronomy, geography etc, in the dilect of the people···'

[তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে একটা ফাণ্ড খোলার চেষ্টা কর। কয়েকটা ম্যাজিক-লণ্ঠন, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য কেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গরীব, অনুন্নত এমনকি চণ্ডালদেরও জড়ো করো, প্রথমে তাদের ধর্ম উপদেশ দাও, পরে ম্যাজিক লণ্ঠনের ও অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি তাদের চলিত (কথা) ভাষার মাধ্যমে শেখাও।

—অনূদিত]

একই ধরনের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন তারিখে হরিদাস বিহারীদাশ দেশাই মহাশয়কে লেখা চিঠিতে[৪]।

'Now suppose the villagers after their day's work have come to their village and sitting under a tree or somewhere are smoking and talking the time away. Suppose two of these educated sannyasins get hold of them there and with a camera throw astronomical or other pictures,

---

৩. Letters of Swami Vivekananda : New Edn. 1960 (Aug). P 128.

৪. ibid P. 136.

scenes, maps, etc—and all this orally—how much can be done that way, Diwanji ?'

[মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসীরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটা গাছের তলায় অথবা অন্য কোন জায়গাতে জড়ো হয়ে গল্প ক'রে সময় কাটাচ্ছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে ছায়াচিত্র বা ক্যামেরার সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বা অন্যান্য ছবি দেখাতে পারেন। অথবা দেশবিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখিয়ে কিছু শিক্ষা দিতে পারেন। এইভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যেতে পারে দেওয়ানজী!

- অনূদিত]

জনসাধারণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবার অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করবার এই ধরনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আমাদের দেশে তাঁর আগে কেউ করেছেন কি না জানি নে। এখনও এধরনের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। এর পরবর্তী কালে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি আরো গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। যেকালে বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হ'ত, সেই সময়ে তাঁর বিজ্ঞান প্রীতি অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতারা যে বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলেন স্বামী-বিবেকানন্দেরই নির্দেশানুসারে, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সালের ২০শে জুন তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে[৫] তিনি লিখেছেন -

শুদ্ধানন্দ লিখছে—কি Ruddock's practice of Medicine পাঠ হচ্ছে।

---

৫. পত্রাবলী, ২য় খণ্ড (২য় সং) পৃ ২৩৫।

ও-সব কি nonsense ক্লাসে পড়ান ? এক সেট Physics আর Chemistryর সাধারণ যন্ত্র ও সাধারণ telescope ও একটা microscope ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু* সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry Practicalএর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন** Physics ইত্যাদির উপর। আর বাঙলা ভাষায় যে সকল উত্তম Scientific পুস্তক আছে তা কিনবে ও পাঠ করবে।

অধিকাংশ সময়তেই স্বামীজী জোর দিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার দিকে। সন্ন্যাসী হলেও সংসারের বাস্তব প্রয়োজন তিনি কখনো ভোলেন নি। তিনি মনে করতেন যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা আসে না, তা শিক্ষাই নয়। যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, তাই হচ্ছে শিক্ষা। সে সময়ে যে শিক্ষা বহুল প্রচলিত ছিল তা কেবলমাত্র ছাত্রদের বাহিক হাল-চাল বদলে দিয়েছে, অথচ নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষমতা এনে দেয়নি। তার ফলে অর্থাগমের কোন উপায় হচ্ছে না। তাই বারে বারে তিনি বলেছেন technical education চাই, অনেক ইণ্ডাস্ট্রি চাই। বলেছেন, 'একটু technical education পেলে লোক-গুলো কিছু ক'রে খেতে পারবে: চাকরি চাকরি ক'রে আর চেঁচাবে না।'

শুধু এতেই তিনি তৃপ্ত নন, তাঁর পরিকল্পনা আরো বৃহৎ। বিদেশে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলেরা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে

* ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ।

** স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

দেশে ফিরে কাজ আরম্ভ করুক, স্বদেশের স্থান বিদেশে গৌরব-মণ্ডিত হোক এ তাঁর মনের একান্ত বাসনা। একদিন কথাচ্ছলে তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'কতকগুলি অবিবাহিত গ্রাজুয়েট পাইতো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কারিগরি শিক্ষা পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তাহ'লে বেশ হয়।'[৬] আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি একদিন বলেছিলেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ধর্মকর্ম বা দর্শন তেমন বোঝেন না। বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় কথা বললে বোঝেন। তারা সকলেই ইলেকট্রিকের মধ্যে দিয়ে জাতটাকে দেখতে চেষ্টা করে। স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল এদেশের ছেলেরা সেখানে গিয়ে তড়িৎ-বিজ্ঞান শিখে এসে এদেশে কাজে লাগুক। বিবেকানন্দ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য লিখে রেখেছেন। স্বামীজী বলেছেন :---

> আমেরিকাটি যেন বিদ্যুতে পরিপূর্ণ। উহারা সব কাজ বিদ্যুৎ দিয়া করিতে চাহিতেছে। আমি **টেস্‌লা** ও **এডিসন** প্রভৃতির সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম যে ওরা ধর্মকর্ম বা Philosophy অত বোঝে না, ওদের electricএর কথা বোললে ওরা বুঝতে পারে। ওরা জাতটিকে দেখছে electricএর ভিতর দিয়ে। আমি চাই আমার দেশের ছেলেরা আমেরিকা গিয়ে electricity খুব শিখে। Electricityটা বিদ্যুতের ব্যাপার। ভারতবর্ষের যুবকেরা চলুক গিয়ে ভাল করে শিখে এসে দেশের কাজে লাগাক। আমেরিকায় যে জিনিসটি দেখছি, যেখানে যাচ্ছি সব

---

৬. প্রিয়নাথ সিংহ : স্বামিজীর স্মৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, শতবর্ষ সং।

একেবারে বিদ্যুতে ভরা আর সেইজন্য জাতটা এত টপ্ টপ্ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে।[৭]

কেবলমাত্র প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার নানা জটিল তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। বিজ্ঞান ও ধর্মকে রেখেছেন সমবিন্দুতে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রখর জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে নানা প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। জীববিজ্ঞান, বিশেষতঃ ক্রমবিবর্তনবাদের মত জটিল বিষয় তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। বরং তার এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন – তা যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে তা পরিস্ফুট হবে।

চারিদিক তাকিয়ে দেখলে সহজেই অনুভব করা যাবে যা কিছু আমাদের চোখে পড়ছে, তার প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই বিজ্ঞানের যোগাযোগ আছে – এমন কি, আমরা পথ চলি ফলিতবিজ্ঞানের রীতি অনুসরণ ক'রে। সংবাদ প্রেরণ, পড়াশুনা, স্বাস্থ্যবিধি, জনস্বাস্থ্য, ব্যাধির প্রতিকার প্রভৃতি সব কিছুই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে করতে হয়। ফলিত-বিজ্ঞানকে (টেকনলজি বা অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স) বাদ দিয়ে আধুনিক জগতে চলা অসম্ভব ব্যাপার।

যেদিন বিজ্ঞান কলকব্জার আমদানি করলো সেদিন থেকেই ক্রমাগত ভাবে কলের উন্নতি সাধনের কাজে সে ব্যস্ত। প্রতি বছর কেন, প্রতিমাসেই নানা পরিবর্তন হচ্ছে, আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন কলকব্জা। ক্রমে উন্নতির বেগ হয়ে উঠছে প্রবলতর। তার ফলে শিল্পে, উৎপাদনের প্রণালীতে ক্রমেই নানা বিপ্লব ঘটে চলে। এই

৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড।

বিপ্লবের প্রধান কারণ বিদ্যুৎশক্তির ক্রমশঃই অধিকতর ব্যবহার। বিংশ শতাব্দীতে বিরাট একটি বিদ্যুৎ-বিপ্লব পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে। তার ফলে জীবনযাত্রার রীতিটাই সম্পূর্ণ যাচ্ছে বদলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছিল যন্ত্র-যুগের; বিদ্যুৎ-বিপ্লবের ফলে আমরা এখন ছুটে চলেছি শক্তিযুগের দিকে।

যন্ত্রের দ্বারা কেবলমাত্র অন্নসংস্থানের পথই সুগম হয় তা নয়, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলে বিকাশোন্মুখ ছেলে-মেয়েদের মনে উৎসাহ আসে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা, এবং টেকনলজি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহলে তারা জানতে পারবে আধুনিক জগৎকে, তাদের মন বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য:

> 'There is something very wonderful about high achievements of science and modern technology (which no doubt will be bettered in the near future), in the Superb ingenuity of scientific instruments, in the amazingly delicate and yet powerful machines, in all that has flowed from the adventurous inquiries of Science and its applications, in the glimpses into the fascinating workshop and process of nature, in the fine sweep of science, through its myriad workers, in the realms of thought and practice and above all, in the fact that all this has come out of the mind of man.'

যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা পুঁথি-প্রধান

শিক্ষা। ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজনে সেই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তার ফলে কেরাণী, উকিল, ডেপুটি ছাড়া আর কিছু তৈরী হ'ত না। সুতরাং মানুষের বিবিধ রুচি ও বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে নানাধরনের কারিগরি শিক্ষায় এদেশবাসীকে শিক্ষিত করতে স্বামীজীর একান্ত বাসনা ছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র হবে সুসমঞ্জস। যেমন থাকবে মানসিক ঔৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা, তেমনি থাকবে নিরলস ও প্রাক্‌টিক্যাল হয়ে ওঠার সুযোগ। স্বামীজীর বক্তব্য পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে কেবলমাত্র কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই জাতি বড় হয়ে উঠবে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন।

উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে সব চিন্তানায়ক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কথা গভীরভাবে ভেবেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের চেয়ে কোন অংশে কম চিন্তা করেন নি। এদেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারিগরি শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি একথাও বলেছেন যে অতিমাত্রায় শিল্পমুখী শিক্ষা মানুষকে কেবলমাত্র অর্থোপার্জনেব দিকেই প্রধাবিত করে। তাই তার জন্য তিনি চেয়েছেন সুস্থ সমন্বয়।

পরাধীনতার বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রয়োজন জ্ঞানের, মানসিক জড়তানাশের। তারপর যখন স্বাধীনতা পাবো, তখন অগ্রসর হবো জ্ঞানের প্রশস্ত পথে স্বাধীনভাবে। বিজ্ঞানের নানা তথ্য, যা আমাদেরই দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা সবচেয়ে আগে জানতে হবে। সেই সঙ্গে ইংরেজীভাষা, পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষা আমাদের পর্যাপ্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হলে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন এবং তার জন্য যা-কিছু

দরকার তা করতেই হবে। তাঁর উক্তি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করবো—

> 'What we need is to study independent of foreign control, different branches of knowledge that is our own and with it the English language and Western science; we need technical education and else that will develop industries,'. 'So that men, instead of seeking for Service, may earn enough to provide for themselves and save something against a rainy day.'

কেন বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে দেশকে? এ কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের প্রশ্ন। অর্থনৈতিক মান উন্নত করতে হলে প্রয়োজন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার; এর সঙ্গে কৃষিব উন্নতি তো আছেই। স্বামীজী অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বুঝেছিলেন বাণিজ্যের মারফত একসময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেছে। তিনি বলেছেন—

> 'অনাদিকাল হতে উবরতায় আর বাণিজ্যশিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতীকাপড়, তূলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মোতি ইত্যাদি ব্যবহার ১০০ বছর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত! তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হ'ত না। আবাব লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রী প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হ'ত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করত।...বাবিল, ইরাণ, গ্রীস, রোম, প্রভৃতি

প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভব করত, তা অনেকে জানে না।'[৮]

প্রাচীনভারতে শিল্প ছিল গৃহজাত। অর্থাৎ তা হ'ল কুটিরশিল্প। সেই কুটিবশিল্পেব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অস্তমিত। বিবেকানন্দ এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি দেখলেন যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ছাড়া আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। পাশ্চাত্যের মিশনারীদেব সম্বন্ধে তাঁব অভিযোগ যে তাঁরা নগদ দেড় টাকা দিয়ে একটি ক্রীশ্চান বানিয়েছেন কিন্তু তাদেব দেশের শিল্প সমৃদ্ধির জন্য কিছুই করেননি। অনেকে অনুমান করেন স্বামীজীর আমেরিকা যাবার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই নয়, সে দেশ থেকে শিল্পপ্রগতি অনুধাবন করে আসা তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজী শিল্প শিক্ষাদানে সমর্থ এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন একথা তাব চিঠিপত্রে প্রকাশ পেয়েছে এবং জামসেদজী টাটার পত্রেও স্বামীজীব বক্তব্য জানা যায়।

আমেরিকা পৌছে ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগে এক বক্তৃতায় ভারতের শিল্পপ্রয়োজন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। সালেমে একটি ঘরোয়া সভায় (২৯শে আগষ্ট, ১৮৯৩) তিনি যা বলেছিলেন 'সালেম ইভনিং নিউজ' তা তুলে ধরেন—

'He spoke at some length of the condition of his people and their religion · He said the missionaries had fine theories there and started with good ideas, but had done nothing for the industrial condition of the people. He said Americans, instead of sending out Missionaries

---

৮. পরিব্রাজক।

to train them in religion, would better send give them one out to some industrial education.'[৯]

[বক্তা (বিবেকানন্দ) কিছুক্ষণ তাঁর স্বদেশবাসীদের অবস্থা ও ধর্ম সম্বন্ধে বলেন।...তিনি বলেন যে মিশনারীরা সেখানে (ভারতে) অনেক ভাল ভাল তত্ত্বকথা বলেন, গোড়াতে তাঁদের অনেক হিতকর কল্পনাও ছিল, কিন্তু তাঁরা দেশের লোকেদের শ্রমশিল্প সংক্রান্ত উন্নতির জন্য কিছুই করেন নি। তিনি বলেন যে আমেরিকানদের কর্তব্য (ভারতে) ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনারীদের না পাঠিয়ে শ্রমশিল্পের (কারিগরিবিদ্যা) শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোক পাঠানো।—অনূদিত]

এরপরে স্বামীজী তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য বলেছেন। আমেরিকার 'সালেম ইভনিং নিউজ' (ইউ. এস. এ) বলেছেন—

'The speaker (Swamiji) explained his mission in this country to be to organize monks for the industrial purposes, that they might give the people benefit of this industrial education and thus elevate them and improve their condition.'[১০]

[বক্তা স্বদেশে তাঁর কর্মপদ্ধতির সম্পর্কে বলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ ক'রে দেশের শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষণের কাজে লাগাবেন, যাতে জনগণ প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষালাভ ক'রে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে।—অনূদিত]

আমেরিকার 'ডেলি গেজেট' পত্রিকাতেও (২৯শে আগষ্ট,

---

৯. Marie Louise Burke : Swami Vivekananda in America, New Discoveries (1st Edn). P 32.

১০. ibid.

১৮৯৩) স্বামীজীর বক্তৃতার অংশ প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকাতেই স্বামীজীর বক্তৃতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসীদের শিল্পশিক্ষার বিষয়টি বিবেকানন্দের কাছে কেবলমাত্র 'উপদেশ' ছিল না। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বলরাম বসুর বাড়ীতে গুরুভাইদের ডেকে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রপাত করেন। এই মিশনের 'উদ্দেশ্য' কি তারও খসড়া রচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছাপা বিবরণীতে আছে—

'মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।'

মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে শিল্পবিষয়ে আরও উল্লেখ পাওয়া গেছে—

> 'এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট করিতে হইবে ; এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইবে।'[১১]

আবার একস্থানে আছে—

> 'মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায় ; যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর সমাজ বন্ধন সমাজ-শাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।
>
> মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল,

১১. সরলাবালা সরকার : স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ।

স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।'[১২] [মঠের ২৭ ও ২৮ নং নিয়ম]

বিজ্ঞান এবং টেকনলজিকে তিনি ভালবাসতেন গভীরভাবে। কিন্তু নিজের জীবনসীমা অল্প ছিল বলেই হয়ত নিজের হাতে তার কোন প্রয়োগ করতে পারেন নি।

একবার মঠে পাঁউরুটি তৈরী করবার জন্য স্বামীজী নানা ধরনের খমির নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। বারে বারে অকৃতকার্য হলেও তা ছেড়ে দেন নি। মঠের স্বাস্থ্য ভাল না থাকার প্রধান কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। স্বামীজী না বুঝে বিলেতী প্রণালীতে 'আর্টিজান কূপ' খোঁড়ার জন্য যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত মিস্ত্রীর অভাবে তা আর কাজে পরিণত হতে পারেনি।

তা না হোক ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে তীব্র ছিল তা প্রতি কথাতেই টের পাওয়া গেছে। যদিও তাঁর এই প্রীতি বাস্তব প্রয়োজনকে লক্ষ্য ক'রে হতে পারে। একথা সত্য টেকনলজি মানুষকে দেয় নিশ্চিত আরামের প্রতিশ্রুতি। এদেশে তার প্রয়োজনীয়তা তখন যেমন, এখনও তেমনি প্রবল। সেই যুগে যখন যন্ত্রকে অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষেরাও হেয় জ্ঞান ক'রে এসেছেন, সেইকালে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ছিল অতি মডার্ন। তাই তাঁর কথায়-বার্তায় টেকনলজির জয়গান, বিজ্ঞানের বিজয়বার্তার ঘোষণা। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি তাঁর

১২. সরলাবালা সরকার : স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ।

প্রতিষ্ঠিত সংঘ কর্তৃক পরিচালিত নানা টেকনিক্যাল স্কুল, কলেজ। পরিচালিত হচ্ছে চিকিৎসালয়, গবেষণাগার। মানুষের প্রয়োজনে, স্বদেশের হিতার্থে।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী। তাই তাঁর বিজ্ঞান প্রীতি অনেকের কাছে অবাঞ্ছনীয় এবং কারো কারো কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে। তা হবার কারণ নেই, যেহেতু বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মকে তিনি পৃথক ক'রে দেখেন নি। এদের প্রত্যক্ষ করেছেন সমদৃষ্টিতে, রেখেছেন সমবিন্দুতে।

কারিগরি-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বদাই স্বীকার করেছেন, তাই বলে একথা মনে করেননি যে যন্ত্র মানুষকে সুখী করবে। তিনি বলেছেন,

> ঃ যন্ত্র কখন মানুষকে সুখী করেনি, কখনও করবে না। যে আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে যন্ত্র আমাদের সুখী করবে, সে জোর ক'রে বলে যন্ত্রেই সুখ আছে; প্রকৃতপক্ষে সুখ চিরকাল মনের। যে লোক মনের উপর প্রভুত্ব করতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হ'তে পারে, অপরে নয়। আর এই যন্ত্রের শক্তি কি? যে লোক তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করতে পারে তাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলবো কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি তড়িৎপ্রবাহ পাঠাচ্ছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে অবনত হ'য়ে তারই উপাসনা কর না কেন· যতদিন মানুষ তার নিজের মধ্যে সুখী হবার শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেকে জয় করতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হতে পারবে না।'[১৩]

---

১৩. The Complete works of Swami Vivekananda, vol IV P 155, 8th Edn. [লেখক কর্তৃক অনূদিত]।

বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম ও বিবেকানন্দ

আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান (বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা) এবং দর্শনের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হলেও একথা আজ অনস্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে একটা সুগভীর সম্পর্ক বর্তমান ছিল। দর্শনশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে একক চর্চার কাল সুপ্রাচীন। কয়েক সহস্র বৎসরের সীমা অতিক্রম ক'রে পরিপুষ্ট হয়েছে আজকের দর্শনশাস্ত্র—তবে বিজ্ঞানের অনুশীলন কাল তার থেকে প্রাচীনতর কিনা বলা শক্ত। একথা সত্য, পদার্থবিদ্যা এবং দর্শনজ্ঞানমার্গের এই উভয় অংশ মানব সৃষ্টির উষাকাল থেকে তাদের জয়যাত্রা সুরু করেছে। এই দুটি মার্গের প্রভায় আলোকিত মানবসমাজ প্রথম উপলব্ধি করতে পারলো তাদের আদিম পুরুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে নিজেদের পার্থক্য।

বাইবেলে আছে, প্রথম মানব এবং আদিমতমা মানবী নন্দন কাননে নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করেছিল বলেই অখণ্ডনীয় পাপ আমাদের অদৃষ্টের জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে প্রথম ঘটনা স্বর্গ হতে বিদায়। সকলেই জানি তাঁরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করেছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে পৌরাণিক কথা। খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা যাই বলুন না কেন আদম এবং ঈভের নিষিদ্ধ ফল গ্রহণের প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন কৌতূহলী বৃত্তির ইঙ্গিত দেয় না কি? এই বিশেষ বৃত্তি- অজানাকে জানবার স্পৃহা, অন্ধকারের গহন প্রদেশে আলোকের প্রতিফলন ঘটানো, অজ্ঞানের রাজ্যকে জ্ঞানসূর্যের প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলা মানুষের সর্বকালীন বিশেষত্ব।

ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হতে লাগলো মানুষের শ্রেষ্ঠ

সম্পদ মস্তিষ্ক, প্রস্ফুটিত হ'তে থাকলো তার চিত্ত শতদল আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠল তার কৌতূহল স্পৃহা। এই স্পৃহা দ্বিধা বিভক্ত হ'ল একটি বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে আর একটি মনোজগতের তাড়নায়। প্রথমোক্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানেব আর দ্বিতীয়টি থেকে উদ্ভূত হয়েছে দর্শন শাস্ত্রের।

আদিম মানুষের কাছে এই পৃথিবী ছিল অপরিচিত। সে ছিল অজ্ঞান। ক্রমে তাবা অনুভব করতে লাগলো যে এই অজ্ঞানতার জন্যই তাদের সুখ শান্তি এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে, বিঘ্নিত হ'তে চলেছে। একসময় তারা ভালবেসে ফেললো অচৈতন্য পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, কিন্তু তা অল্পদিনের জন্য। জীবনদায়ী, প্রাণ উত্তপ্তকারী সূর্যরশ্মি এবং শীতলকরা বৃষ্টিকণায় উৎফুল্ল মানুষ যখন বজ্র, অশনি এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সম্মুখীন হ'ল তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। একই অনুভূতির শিহরণ বয়ে গেছে তার সর্বদেহে যখন জিঘাংসু বন্য জন্তু ও মানুষ-শত্রুর মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। এই ভয় তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

চারপাশের অচেতন বস্তুনিচয়ের মধ্যে আরোপিত করলো তার মানবিক ইচ্ছা প্রবৃত্তি। প্রকৃতির নানা বস্তুকে নিজের পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির রঙে রূপান্বিত করে তুললো। তাদের কল্পনা যেন রূপায়িত হয়ে প্রতিমূর্ত হ'ল ঐ সব অচেতন পদার্থের মাধ্যমে। তারা সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্পিত যক্ষ, রক্ষ, দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগিনী, ডাকিনী, যোগিনীতে পরিপূর্ণ ক'রে ফেললো। অ্যাণ্ড্রু ল্যাং বলেছেন, 'সমগ্র প্রকৃতি যেন আরোপিত বা কল্পিত প্রাণসত্তায় ভরে উঠলো। আদিম মানব এদের প্রত্যেকের মধ্যে দোষ গুণ আরোপ ক'রে কাউকে বললো তার মিত্র আর কাউকে বানালো শত্রু।

একাজে মানুষ যে সব সময় ভুল করতো তা মনে হয় না, কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস। একবার সে যা করেছে পরবর্তী বারেও সে তাই করতে চায়। এমনকি জন্তু জানোয়ারেরাও তা ক'রে থাকে। যেখানে একবার অতীতে তারা যন্ত্রণা পেয়েছে সেখানে তারা আর যেতে চায় না। তার আশঙ্কা সেখানে গেলেই আবার কষ্ট। যে স্থানে গিয়ে পূর্বে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই তারা আবার যায় আহার্য লাভের প্রত্যাশায়। এমনি ভাবে যেসব কাজ পশুরা অভ্যাসের বসে করতো, চিন্তাশীল মানুষেরা তাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে আখ্যা দিলেন এবং এর থেকেই ধীরে ধীরে নানা রহস্যের উদ্ঘাটন হতে থাকলো। একবার যা ঘটলো, অনুরূপ পরিস্থিতিতে পুনর্বার একই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। একই ঘটনা পরের পর আবির্ভূত হয় না, বেশ কিছুকাল অতিক্রম করে নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার পুনরাবির্ভাব হয়। এই আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানের জন্ম হ'ল। এই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের প্যাটার্ণ আবিষ্কার করা, কি ক'রে এরা অচেতন পৃথিবীকে শাসন করে তার অনুসন্ধান করা।

এই গবেষণার কাজে খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন বা রয়েছেন তাঁরা একাধারে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। কেবলমাত্র দার্শনিক এবং নিছক বিজ্ঞানীর সংখ্যা বেশী হলেও এই দ্বৈত সত্তার অধিকারী ব্যক্তিরা পৃথিবীর মানুষকে নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন যুগে যুগে।

আদিম মানুষের জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য ছিল : মৃত্যু—পুনরুজ্জীবন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়েছিল সেকালীন বিশ্ববীক্ষায় এবং উদ্ভিদে-ঋতুতে-সৌরজগতে প্রাণের ও গতির বিচিত্র লীলা পর্যবেক্ষণের মধ্যে। প্রস্তর যুগের অবসানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য বেড়ে গেছে অনেক। দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের আদিম ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও

আত্মীয়তার বন্ধন এখনো বর্তমান। বিজ্ঞানমনস্ক গ্রীক জাতির বিজ্ঞান, দর্শন সবই তত্ত্বীয় এবং তা বহুমুখী। যার সার্থক ফলশ্রুতি সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল। গ্রীসের অবদানে প্রভাবান্বিত রোমীয় বিজ্ঞানে প্রাধান্য পেয়েছে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক। রোমক দর্শনেও এই মেজাজ ফুটে উঠেছে। বেদের পরবর্তী ভারতেও বিজ্ঞানচর্চার অনুগামী ঈশ্বরনিষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্য প্রাচ্যের মরমীয়া সাধনায়, দর্শনেও এরই ছায়াপাত ঘটেছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য: 'দর্শন পর্বতশিখরে আরোহণ ক'রে নিজ সিদ্ধির তপস্যায় মগ্ন থেকে মানুষের জীবন ও তার দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে এবং মানুষের বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সংযোগহীন মূল তত্ত্বানুসন্ধানেই সে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। যুক্তি ও বিচার দ্বারাই দর্শন পরিচালিত, নিজ মাধ্যমে যুক্তির ব্যাপকতা ও বিকাশে দর্শন প্রভূত সহায়তা করেছে। কিন্তু সে যুক্তি অনেকাংশে মানসপ্রসূত, বাস্তব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।'

বিজ্ঞান আবার এই মূল তত্ত্বানুসন্ধানকে উপেক্ষা ক'রে বাস্তবকেই বড় ক'রে দেখেছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে একসঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসে বিচিত্র এক বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা গড়ে তুলল। জ্ঞানার্জনের অসংখ্য নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত ক'রে দিল এবং মানুষের শক্তি এতদূর বৃদ্ধি ক'রে দিল যে মানুষ এই প্রথম অনুভব করল যে সে তার পারিপার্শ্বিককে জয় ক'রে তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এখন মানুষ যেন একটা পার্থিব প্রাকৃতিক শক্তিতেই রূপান্তরিত হ'ল—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের সাহায্যে সে যেন পৃথিবীর রূপই বদলে দিতে সুরু করলো। কিন্তু যখন সে অনুভব করলো যে এ পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা তার আয়ত্তাধীন, তার ইচ্ছানু-

যায়ী নতুন ক'রে তা গড়ে তুলতে সক্ষম, তখনও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল। কি একটা মূল উপাদানের যেন অভাব থেকে গেল। তার কারণ মূল তত্ত্ব অথবা আশু লক্ষ্য কোনটার সন্ধানেই বিজ্ঞান তাকে কোন নির্দেশই দেয়নি। মানুষ পরে প্রকৃতির দুর্জয় রহস্য ভেদ ক'রে তাকে জয় ক'রে নিজের আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু আজ পর্যন্তও মানুষ নিজেকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারেনি। তাই তার নিজের সৃষ্ট দানবীয় শক্তির উন্মত্ততায় নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

একথা সত্য যে, পদার্থবিজ্ঞান যে সমস্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নানা বিষয়কে প্রভাবিত ক'রে তাদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছে কিন্তু সেই ঘটনাবলী কেমন ক'রে সৃষ্টি হ'ল তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, এমন কি লোকোত্তর প্রতিভার কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি? এর সংজ্ঞা কি? এর উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া শক্ত। বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্নকালে এর নানা ব্যাখ্যা হয়েছে, বহু অর্থ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মতান্তরের শেষ নেই। ওয়েবষ্টার প্রথম এর অর্থ দেন 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান'। মধ্যযুগের দার্শনিকবৃন্দ বিশেষতঃ সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ ধর্ম-তত্ত্বকেও বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন।
এ সম্বন্ধে Stewart. C. Easton লিখেছেন[১],

> "In the great medieval question : 'Is theology a Science ?'···the word Science has this meaning, and is to be specially distinguished from faith. Do we know that God exists, or do

১. Roger Bacon and his search for a universal Science, Oxford, 1953.

we only believe it ? St. Thomas claims that we know this truth, and would know it even if there were no inspired book in which we believe."

ওয়েবষ্টার বা এনসাইক্লোপেডিয়া বিটানিকাতে বিজ্ঞানের নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনটিকেও যথার্থ বলে মনে হয় না। প্রবন্ধের উপক্রমণিকাতে যা বলা হয়েছে তা-ই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অর্থাৎ বিজ্ঞান এমন এক জাতীয় ব্যবস্থা যার সাহায্যে মানুষ তার প্রতিবেশ, পরিবেশের উপর আধিপত্য করতে পারে। এ সম্পর্কে ক্রাউথারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন[২],

'Science is the system of behaviour by which man acquires mastery of his environment. His evolution from an animal into a man was accomplished by a new attitude towards nature, in which he began to study the contents of his environment in order to use them in advantage. His initiation of this activity brought Science into existence.'

আয়োণীয় এবং আণবিক মতবাদে আস্থাশীল এপিকিউরীয় দার্শনিকেরা মনে করতেন মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের এবং এই প্রয়োজন মেটাবার কাজ বিজ্ঞানের। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো বিজ্ঞানকে এভাবে দেখেননি। তিনি বলেছেন যেমন দর্শন তেমনি বিজ্ঞানও মানুষের উদ্ভাবনী মনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকে মানুষের উপকার হ'তে পারে, তবে প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে একথা মেনে নেওয়া চলে না। এডিংটন, হোয়াইট-

২. J. G. Crowther : The Social Relation of Science.

হেড, ডীন ইন্‌জ, বিশপ অব বর্মিংহাম প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা মনে করেন ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রভৃতি জটিল রহস্যের উদ্‌ঘাটন করাই বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য। অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল তাঁর, 'The Social Function of Science' গ্রন্থে এর প্রতিবাদ করলেও পূর্বেকার মতবাদ যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে রেনেশাঁ-পূর্ব বিজ্ঞানের বড়ো পার্থক্য যে, তখনকার বিজ্ঞানের কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না, যা আজকের দিনে আছে। তখনকার দিনে বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। মধ্যযুগের ইস্লামীয় এবং ল্যাটিন ইউরোপেও এরা একইভাবে স্পন্দিত হ'ত। গ্রীকদের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান দর্শনেরই নামান্তররূপে গণ্য হ'ত।

দর্শন কি, তা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। হবস্‌ (১৫৮৮—১৬৭৯) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'a knowledge of effects from their causes and of causes from their effects.' দার্শনিকদের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাৎ এখানেই। দার্শনিকেরা সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর প্যাটার্ণ আবিষ্কার করতে চান আর বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য অচেতন প্রকৃতির ঘটনাসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটন।

হেগেলের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুরূপ। দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'die denkende Betrachtung der Gegenstande,' চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার অনুসন্ধান করে দর্শন। কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে যদিও তা বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান কার্য ও কারণের সম্পর্ক বের করে পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। বিজ্ঞানের কারখানা হ'ল তার ল্যাবরেটরী অথবা উপযুক্ত প্রান্তর, নচেৎ নক্ষত্র-খচিত

আকাশ; আর দার্শনিকের কারখানা তাঁর মস্তিষ্ক। যেভাবেই আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনের সংজ্ঞা রচনা করি না কেন, তাদের সীমানা বেশ অস্পষ্ট, জটিল। বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয় (বলাবাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়), দর্শন সেখান থেকে সুরু করে তার যাত্রা। বিজ্ঞানের যেমন অনেক বিভাগ আছে, দর্শনেরও তেমনি। বিজ্ঞানেব রাজত্বে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন সঠিক সীমারেখা নেই, এর রহস্য অতি জটিল, এ যেন বিজ্ঞানের দুনিয়ার প্রান্তসীমায়, ঠিক তেমনি দর্শনের দিকে 'মেটাফিজিকস্'। পদার্থবিদ্যাব 'পজিটিভিষ্ট' মতবাদ মেনে নিলে দুয়ের সীমারেখার হদিশ পাওয়া যায়। ফিজিকস্ যেখানে রহস্যের সন্ধানে দিশেহারা, মেটাফিজিকস্ সেখান থেকেই সুরু করেছে তার যাত্রা, একথা অনেকে মনে করেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা কবলে দেখা যায় ধর্মসাধনার অতি চাপেও বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষা নিভে যায়নি। ধীরে ধীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে শিখা প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠল। রেনেশাঁসের আবহাওয়াতে আলোকিত হয়ে উঠলো ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের দীর্ঘ জটিল পথ। মৌলিক অনুশীলন, গবেষণা, আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ ব্যাপকতব হয়ে উঠলো। বেনেশাঁসেব প্রাণশক্তি হ'ল যন্ত্রশক্তি। তার উন্নতিতে এল নতুন জীবনের জোয়ার। নতুনতর পথে সে এগিয়ে চলল শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। কারিগরি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী তত্ত্ব-দর্শনের উদ্ভব। জীবনের পুরোনো চেহারা গেল পালটে। মানুষ বুঝতে শিখল, এই বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। ঈশ্বব কেউ নন। তারা জানলো সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী, ঘুরছে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের দল। সে অনুভব করতে পারলো, তার জন্ম দেবতার

অনুগ্রহ নয়। নিম্নতর প্রজাতি থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সে এসেছে এই স্তরে। নতুন বুদ্ধি, মননশক্তি দিয়ে মানুষ বিচার করতে শিখল যাবতীয় ঘটনাবলী। বিজ্ঞান নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে যেমন জীবনের বাইরের চেহারা পালটে দিল, তেমনি মনো-জগতেও তার প্রভাব পড়লো। দর্শনে তাব ফুল ফুটে উঠলো। বিজ্ঞান জন্ম দিল নতুনতর বস্তুতন্ত্রী জীবনদর্শনের। তার ধারা সজীব হয়ে উঠেছে মার্ক্স এঙ্গেলস থেকে।

পৃথিবীর নানা শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একসময় দর্শন বিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এখন তো বিরোধ যেন স্পষ্টতর।

ক্রমবর্ধমান আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সঙ্কটে মানুষ হয়ে পড়লো নিঃসঙ্গ। সে হ'ল অসহায় বিচ্ছিন্ন, তার চিত্তে বাসা বাঁধলো শূন্যতা, বিষণ্ণতা, অবসাদ। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'নিউরসিস সুইসাইড'। কেঁপে উঠল দর্শনের তুরীয়লোক। পুনরুজ্জীবিত হ'ল কিয়েরগার্ডের রহস্যবাদ। দেখা দিল অহংমুখর 'অস্তিত্ববাদ,' অ্যাবসারডিটির তত্ত্ব। দার্শনিক বিজ্ঞানী ও অনেকে বিরোধিতা করলেন আধুনিক বিজ্ঞানের। অনেকে আবার গাণিতিক সিঁড়ি বেয়ে ফিরিয়ে আনতে সঙ্কল্প করলেন পুরোনো 'ঈশ্বরতত্ত্বকে'। এমনিভাবেই জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়ে চলেছে আধুনিক চিন্তাশীলদেব জগতে। বিশ্বের যে অনন্ত রহস্য আমাদের সামনে রয়েছে তার সমাধানের মন্ত্র কার জানা আছে—বিজ্ঞানের না দর্শনের? ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যুগে যুগে বহু দার্শনিক-বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অনেক মত প্রচার ক'রে গেছেন। আজ পর্যন্ত কোন মতবাদের মধ্যে নেই সেই রহস্যের সিন্দুক খোলার চাবিকাঠি।

অনেকে মনে করেন দর্শন বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের কথাই ধরা যাক। তিনি ব্রহ্মবেদ প্রতিষ্ঠা করার

অস্ত্ররূপে প্রসঙ্গ তুলেছেন মায়াবাদের। সমগ্র চলমান বিশ্বের সত্তা সেখানে নাস্তির মধ্যে গণ্য। কিন্তু তাহলেও ব্রহ্মের অনুভূতি যতদিন না হয়, ততদিন ব্যবহারিক সত্তাকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। পারমার্থিক সত্তা যথার্থভাবে সত্য ও প্রকৃত সত্তা হলেও আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত বাস্তব বস্তুর সত্তাকে তুচ্ছ ও শূন্য বলা যায় না। তাই দর্শন বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন নয়, তবে বাস্তবকে দর্শন চরমসত্তাশীল বলেনি। বাস্তবের পিছনে কারণের করে না অন্বেষণ এবং সে কারণের তুলনায় কার্য-বাস্তবকে বলেছেন সত্তাহীন।

বিজ্ঞান মূল তত্ত্বানুসন্ধানকে (বাস্তবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সংযোগহীন মূল তত্ত্বানুসন্ধান) এড়িয়ে বড় ক'রে তুলেছে বাস্তবকে। পৃথিবীকে এক লাফে অনেক এগিয়ে নিয়ে সৃষ্টি করেছে বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা, উন্মুক্ত করেছে জ্ঞানার্জনের নানা পথ। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য চিন্তার সাহায্যে বিজ্ঞান পৃথিবীর রূপ পালটে দিলেও সে বহু প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান নীরব।

কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান, সমগ্র-বিজ্ঞানের প্রতিটি সত্য প্রতিটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। বিজ্ঞানের সত্য সনাতন। তা সবদাই এবং সর্বত্র সত্য। শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা কোন উচ্ছ্বাস না মেনে শুধু বিচারের সাহায্যে যে সত্য পাওয়া যায় তাকেই বলবো বিজ্ঞান। যদি এইভাবে বিচার করি তাহলে মনে হওয়া স্বাভাবিক দর্শন ও বিজ্ঞান এক। বিদগ্ধ বিজ্ঞানী এডিংটন অনেকটা একথাই বলেছেন। 'Where Science goes on' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এমন দিন আসবে যখন বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের হবে মিতালী। কেন না সত্যানু-সন্ধানের পিছনে যুক্তি-তর্কের আকুতি উভয়ের মধ্যেই সমান রয়েছে।

সত্যনির্ধারণে দর্শনও বিজ্ঞানের মত বিচার ছাড়া আর কোন কিছু মানতে রাজী নয়। তাহলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান।

বিজ্ঞান সমগ্র জগৎকে বিভিন্ন শাখায় আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কিন্তু দর্শনের কোন অংশীদার নেই। এ ছাড়া আরও প্রভেদ আছে। বিজ্ঞানের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যই সত্য। অবশ্য বর্তমানে এ কথাটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দর্শনের কাছে দৃশ্যত ও পারমার্থিক সত্যের মধ্যে প্রভেদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকেই দর্শনের বিচার সুরু। কিন্তু তাই বলে দর্শন নির্দ্বিধায় সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সে পুনর্বিচার করতে বসে। যেমন ক্রম-বিকাশবাদের কথা। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দর্শন অনেকাংশ গ্রহণ করেছে কিন্তু একথাও বলেছে যে, জীবের আবির্ভাব ও বিকাশ শুধু অচেতন প্রকৃতির সাহায্যেই হয়নি, তার চেয়েও ঊর্ধ্বে কোন সত্তা আছে, যিনি যাবতীয় সৃষ্টিকার্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছেন।

জহরলাল নেহরু একটি সুন্দর কথা বলেছেন:

> 'It is the Scientific approach, the adventurous and yet critical temper of science, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed fact and not on preconceived theory, the hard discipline of the mind all this is necessary, not merely for the application of Science but for life itself and the solutions of its many problems.'

এবারে স্বামীজীর মতবাদ আলোচনা করা যাক। তিনি বলেছেন, জড় বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগ নিয়ে এগোলেই শেষ পর্যন্ত জড়বস্তু ছেড়ে অজড়ে বা চৈতন্যে যেতে হবে। তাঁর ভাষায়[৩] —

৩. ধর্মবিজ্ঞান, সূচনা।

'কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যথা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমনস্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।'

বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, 'সায়েন্স ইজ নাথিং বাট দি ফাইণ্ডিং অব ইউনিটি'। একথা অতীব সত্য যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মূল বস্তু অর্থাৎ সেই 'একক'কে অন্বেষণ করা। বিজ্ঞান যখন সেই লক্ষ্যে উপনীত হবে তখন তার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। ধর্মের বিজ্ঞানও তাই বলে। স্বামীজী বলেন, মানুষ যখন ঈশ্বর বা 'একক' সত্তাব আবিষ্কারে সক্ষম হবে তখনই সাধনার শেষ।

যেমন রসায়নশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ জড়বস্তু-কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেইরকম অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেমন প্রকৃতি রাজ্যের গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন, তেমনি ধর্মশিক্ষার গ্রন্থ হ'ল স্বীয় মন ও হৃদয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের ভিত্তি এক—জ্ঞান বা যুক্তি। তার ফলে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সেগুলিব প্রয়োগে ছাড়া আর তেমন কোন পার্থক্য নেই। বিবেকানন্দ একথা বিশ্বাস করতেন। এমন কি এদের তিনি একই বিষয়েব স্বীকৃতি বলে ভাবতেন।

তিনি এক সময় বলেছিলেন—'মানুষের সকল জ্ঞানই ধর্মের অংশ মাত্র।' অবশ্য এখানে তিনি ধর্মকে জ্ঞানের সমষ্টিরূপেই বিচার

করেছেন। অন্য সময়ে আবার তিনি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানকে বড় ক'রে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

> 'বিজ্ঞান ও ধর্ম, দুই-ই আমাদিগকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চায়। ধর্ম কেবলমাত্র অধিকতব পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার আছে যে, উহা অধিকতর পবিত্র।'[৪]

তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য মাত্র এখানেই যে, 'ধর্মের কারবার অধিবিদ্যাগত বিশ্বের সত্য লইয়া; এবং রসায়ন বা অনুরূপ অন্যান্য বিজ্ঞানের কারবার হইল পদার্থগত বিশ্বের সত্য লইয়া।'[৫] যেহেতু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে, সে কারণেই তার অনুসন্ধানের রীতি-নীতিতেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন—

> 'ধর্মীয় বিজ্ঞানের সম্পর্কে—এই বিজ্ঞান জ্ঞানযোগের অন্তর্গত—বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্যে ধর্মগুলির তুলনামূলক ইতিহাসের যেভাবে চর্চা করা হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত। এবং উহাকে বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতেন।'[৬]

বিবেকানন্দ বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধান হ'ল ঐক্যের অনুসন্ধান। স্বামীজী বলেছেন হিন্দুরা মনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়া, অধিবিদ্যা ও যুক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। ইয়োরোপীয়েরা বহিঃপ্রকৃতি থেকে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁরাও এই একই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁচেছেন।

---

৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড।

৫. ঐ

৬. রোমাঁ রোলাঁ: বিবেকানন্দের জীবন: অনু—ঋষি দাস।

'আমরা দেখিতেছি, মনের মধ্য দিয়া সন্ধান করিয়া আমরা অবশেষে সেই 'একত্বে' সেই বিশ্বব্যাপী একে, সেই সকল কিছুর অন্তর্নিহিত আত্মায়, সেই সকল কিছুর সারবস্তুতে ও বাস্তবতায় গিয়া পৌঁছি।.. বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াও আমরা ঐ একই 'একত্বে' গিয়া উপনীত হই...'[৭]

তাঁর মতে বিজ্ঞান ঐক্যের আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। যখনই বিজ্ঞান ত্রুটিহীন ঐক্যে পৌঁছাবে তখনই তা আর বেশিদূর এগোবে না। যেহেতু এ তখন তার উদ্দিষ্টস্থানে গিয়ে হাজির হবে। রসায়ন যখন এমন একটি উপাদান আবিষ্কার করবে, যা থেকে অন্য সব কিছুই প্রস্তুত হ'তে পারে না, তখন তা আর অগ্রসর হবে না। তিনি বলেন – [৮]

'পদার্থবিদ্যা যখন এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিবে যে, অন্যান্য সকল শক্তি তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং এইরূপ আবিষ্কারের দ্বারা তাহার কাজ শেষ করিবে, তখন, সে-ও থামিয়া দাঁড়াইবে। যিনি মৃত্যুর জগতে একমাত্র জীবন, তাঁহাকে যখন ধর্মীয় বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবে, তখনই তাহা ত্রুটিহীন ও সম্পূর্ণ হইবে। তখন ধর্মও আর অগ্রসর হইবে না। সকল বিজ্ঞানের উহাই লক্ষ্য।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই 'ঐক্য' হ'ল সেই প্রয়োজনীয় প্রকল্প যার উপর বিজ্ঞানের কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রয়োগ, পরীক্ষা এবং যুক্তির পথ বেয়ে অগ্রসর হয়। বৈদান্তিক ঋষি বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অনুমান—সাহস এবং তার কাজের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান—এরা যেন

৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড।

৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২।

দুটি ভাই। এদের মধ্যে বেধেছিল বিরোধ। তাদের মধ্যে মিলন সাধনার প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেছেন—

> 'বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে···মানসিক ঘটনাগুলির পর্যালোচনার ফলে যে সকল বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার প্রকাশ ঘটিয়াছে, সেগুলির মধ্যে—দুঃখের বিষয় এইরূপ পর্যালোচনাকে কেবল 'ধর্ম' নামেই অভিহিত করা হয়—এবং যে ধর্মের উন্নত শির···স্বর্গের গুপ্ত রহস্যকে ভেদ করিতেছে··· সেই তথাকথিত বস্তুবাদী বিজ্ঞানের-প্রকাশগুলির মধ্যে একটি সৌভ্রাত্র্য গড়িয়া তোলা অবিলম্বে প্রয়োজন।'

একজনের সুবিধার জন্য আর একজনকে হটিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। বরং মিলন সাধিত হলে যে নতুন দর্শনের সৃষ্টি হবে তা সকল কালের জাতির ধর্ম হয়ে উঠবে। এ এমন এক পথ হবে যা আধুনিক বিজ্ঞানও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে। বিবেকানন্দের ভাষায়[১০]—

> 'আমরা আজ বুদ্ধিবৃত্তির সূর্যকে বাদ্ধব প্রেম ও করুণার আশ্চর্য অসীম হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে পেতে চাই। এই মিলনের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞান ও দর্শন মিলিত হয়ে করমর্দন করবে। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে। এ-ই হবে ভাবীকালের ধর্ম; আমরা যদি এ ধরনের একটি ধর্মকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে নিঃসংশয়ে তা সকল কালের সমস্ত জাতির ধর্ম হয়ে উঠবে। এবং এ এমন এক পথ যা আধুনিক বিজ্ঞানের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় এই পথেই এসে পড়েছে। যখন কোনো বিজ্ঞানের শিক্ষক বলেন যে, সকল বস্তু একই-

---

১০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড: 'অদ্বৈত ও তাহার প্রকাশ'।

শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তখন কি উপনিষদে বর্ণিত ভগবানের কথাই মনে পড়ে না : এক অগ্নিই যেমন বিশ্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করেন, একই আত্মাও তেমনি প্রত্যেক আত্মার মধ্যে প্রকাশলাভ করেছেন, এবং তা আরও বহু গুণে ?'

স্বামীজী বলেছেন অদ্বৈতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু এই সংযোগের ফলে অদ্বৈত যেন বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, বিজ্ঞানও তার বাণী পরিবর্তন করুক এ দাবীও তার থাকা উচিত নয়। বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলেছেন তা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিল। এ সম্বন্ধে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ সুন্দর কথা বলেছেন—

'মুক্ত ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহাকে বিজ্ঞান গ্রহণ করুক বা না করুক, যিনি নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিতেন সেই বিবেকানন্দের প্রশান্ত দম্ভকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই ; কারণ তাঁহার ধর্ম বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছিল।'[১১]

C. E. M. Joad তাঁর এক গ্রন্থে[১২] বিশ্বসত্যের ধারণা সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলেছেন।

তিনি বলেন :

Prof. Eddington does not think that reality consits of atoms and electrons and he does not think that it is mental or spiritual in character.

---

১১. রোমাঁ রোঁলা—বিবেকানন্দের জীবন : অনু : ঋষি দাস।

১২. C. E. M. Joad—Philosophical aspects of modern Science.

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, এডিংটন-এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসে যুক্তিবত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন, 'ধর্মবিশ্বাস অন্তর্জগতের অনুভূত সত্য-ভিত্তিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তিও ঠিক অনুরূপ।' এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথায়[১৩]—

> 'The attribution of the religious colour to the domain (i,e that of the underlying reality) must rest on inner convictions which seem parallel with the unreasoning trust in reason which is at the basis of mathematics, with an intimate sense of fitness of things which is at the basis of Science.'

বিবেকানন্দও এসম্বন্ধে বলেছেন, যদি যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারাই কোন বস্তুর প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয়, তাহলে বলতে হয় পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যার রাজ্যেও কতকগুলি ঘটনা বেশ অযৌক্তিক। যেহেতু বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে হাজির হওয়ার আগে আমরা কয়েকটি বিষয়কে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেই। বিশ্বসত্যও অনেকটা তেমনি। তার ভিত্তিও কিছু সত্যবস্তু, যা অনুভূতিগ্রাহ্য। তারই ভিত্তিতে আমরা সৃষ্টি করেছি নানা যুক্তি-প্রমাণ। স্বামীজী বলেছেন[১৪]—

> 'সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ্ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা

---

১৩. Sir. Arthur Eddington—Nature of the physical world.

১৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, জগৎ-বহির্জগৎ।

উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি, এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদরাও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক এখন ভাবেন ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছুই নাই। যদি ধর্মলাভ করিতে হয় তবে তাহা বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারা লাভ করিতে হইবে।'

এডিংটন একথাও বলেছেন, যাঁরা ধর্মের অনুভূতি লাভ করেছেন তাঁদের সেই অনুভূতি প্রত্যক্ষ বস্তু। তিনি বলেছেন,—

'There are some to whom the sense of a divine presence irradiating the soul is one of the most obvious things of experience · · · ' 'If we have no such sense then it would seem that not only religion, but the physical world and all faith in reasoning totter in insecurity.'

তিনি বলেছেন একটি প্রণায়ত দর্শনমত পদার্থবিদ্যার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। দার্শনিকেরা মনে করেন যে, এডিংটনের মধ্যে অসঙ্গতি আছে। যেহেতু তিনি 'প্রাতিভাসিক জগৎ ও ঈশ্বর' উভয়কেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ভাবতেও 'পরমাণুবাদী' দার্শনিক ছিলেন, তারা বলেছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অগণন পরমাণু দিয়ে সৃষ্টি হয়।

এডিংটন বলেন পদার্থবিদ্যা আজ যেখানে হাজির হয়েছে সেখানে জগৎকে 'mind Stuff' বলতে হয়। সার জেমস্ জীনস্ একেই বলেছেন, 'mathematical mind stuff'। এ দুটি মতই Scientistদের অধ্যাত্মবস্তুর ধারণায় নিয়ে গেছে।

স্বামীজী বলেন যে, বিজ্ঞান 'পদার্থে' বিশ্বের একত্ব প্রকাশকরে ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ চৈতন্যে। তিনি বলেছেন—

'আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন। তবে তিনি শুধু উহাকে 'জড়' আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। জড়বাদী বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আর আমি বলি ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে।'[১৫]

তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্বামীজীর কথায় বিজ্ঞান ও বেদান্তের একই লক্ষ্য। উভয়েই বহুর মধ্যে একত্বের প্রতিপাদন করছে। বিবেকানন্দের সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, পদার্থ এক ঘনীভূত শক্তি। কোন কোন হিন্দুদর্শনও একই ধরনের কথা বলে। এই ঘনীভূত শক্তিকে তারা বলে 'তন্মাত্রা'। এই 'শক্তিপুঞ্জ'ই চৈতন্য কি না কে জানে। বিশ্বের মূলে চৈতন্যসত্তা অবস্থিত, পদার্থ নয়, তার বেশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে Sorokin-এর ভাষায়[১৬]—

'For this modern science matter has become but a condensed form of energy which dematerialises into radiation. The material atom is already dissolved into more than thirty 'non-material, criptic, arcane, perplexing, enigmatic and inscrutable, elementary particles'. 'the electron and the anti-electron, the proton and the anti-proton,

১৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড, ব্রহ্ম ও জগৎ।

১৬. P. A. Sorokin—'Three Basic Trends of our Time'.

the photon, the meson, etc. or into the image of waves which turn into the waves of probability, waves of consciousness which our thought projects a far...'

বিজ্ঞানকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসেছেন এবং নিজের চিন্তার সঙ্গে প্রচলিত জ্ঞান ও তথ্যকে মিলিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছেন নতুন এক মতবাদ। তাঁর মতবাদ সর্বত্র যে জড়-বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে নাকচ করাও সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান-ধারণাকে আধুনিক কালের উপযোগী ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদ, নিজস্ব চিন্তাধারা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমন্বয় ক'রে ক্রমবিকাশবাদ ও সৃষ্টিরহস্যের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা আশ্চর্যের। ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় অথচ প্রচলিত ধারণা যে অভ্রান্ত, স্বামীজীর বক্তব্য অনুশীলনের পরে তা জোর দিয়ে বলা চলে না। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় তা আমরা উপলব্ধি করবো।

এ প্রসঙ্গে মনে হ'তে পারে বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজীর মতবাদ কি একেবারে নতুন? অনেকে হয়ত তা বলতে পারেন। কিন্তু তা স্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হবে, যেহেতু তাঁর বক্তব্য প্রকাশের আগেও ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকে চিন্তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ভেবেছেন বিজ্ঞান বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা ধর্মের বিরোধী ত নয়ই, বরং মনকে কুসংস্কারমুক্ত করে।

প্রায় নব্বুই বছর আগে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ধর্মের অবিরোধী' প্রবন্ধে[১৭] কোন লেখক বলেছেন,

'এক্ষণে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের ধ্রুব সংস্কার আছে যে,

---

১৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ম কল্প, ২য় ভাগ, শ্রাবণ ১৭৯৮ শক।

পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হই না, বরঞ্চ পদার্থবিজ্ঞান ঈশ্বর হইতে ও ধর্ম হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করে। বাস্তবিক এই সংস্কারটি ভ্রমাত্মক। পদার্থবিদ্যা মিথ্যাধর্মের উন্মূলক, ইহা প্রকৃত ধর্মের পরিপন্থী নহে।·· ···পদার্থবিদ্যা সত্যের সৌন্দর্য ও নিয়মের অলজ্ঘ্যতা প্রদর্শন করিয়া মনকে সত্যের অনুরক্ত ও নিয়মের বশীভূত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে।

পদার্থবিদ্যা নিষ্ঠুররূপে সমুদয় কুসংস্কার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেয়। যেমন সূর্য উদয হইলে সমুদায় প্রকাশ পায় সেইরূপ পদার্থবিদ্যা-প্রভাবে সমুদায় পদার্থও ঘটনার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকতা, অলৌকিক ক্রিয়ার ভান ও ধর্মের অমূলক ভয় সকল পলায়ন করে। মনুষ্যের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হয়। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা লজ্জা পায়, উদারতা বৃদ্ধি হয় ও সমগ্র জগতের মধ্যে এক প্রকার একতানতা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিষয়ই ধর্মের পথের সম্বল। ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশে যত অধিক পদার্থবিদ্যার আলোচনা হইবেক, ততই লোকের মন সত্য-ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হইবে ও ধর্মবিষয়ক উদারতা বৃদ্ধি পাইবেক।'

সেই সময়ে অর্থাৎ স্বামীজীর আগে বা তাঁর সমসাময়িককালে অনেকে এই জটিল তত্ত্বটিকে নিয়ে ভেবেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই। বিরোধ আছে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা উপধর্মের সঙ্গে। কতকগুলি মত বা অনুষ্ঠান যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ প্রচার করে এবং কতকগুলি লোক তাকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে ক'রে অনুসরণ করতে থাকে, নিজের ভাবনা চিন্তাকে বিসর্জন দেয়, তখনই তা উপধর্ম বা সাম্প্রদায়িক

ধর্ম। যারা এই ধরনের ধর্মের ব্যবসায়ী, তারা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে। তারা পৃথিবীব জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তাকে অভিশাপ দেয়, যেহেতু বিজ্ঞান তাদের ঘর ভেঙে দেয়। ঈশ্বর দু'দিনে সমস্ত সংসার সৃষ্টি করেছেন বলে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বিজ্ঞান এই ধর্মমতকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে। এইখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে উপধর্মেব বিরোধ।

স্বামীজীর ছাত্রাবস্থাকালীন সময়ে চিন্তাশীল লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র তাঁর লিখিত 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' প্রবন্ধে[১৮] বলেছেন:

> 'ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানেব বিবাদ নাই; বিজ্ঞানই ধর্মের পথ পরিষ্কাব করে। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু দীর্ঘকাল পূর্বে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণার অধিকারী হওয়া অত্যন্ত প্রশংসার্হ।

বিজ্ঞান কি করতে পারে? তাকে অনুশীলন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় কেন, এ সম্বন্ধে প্রায় ৭৯ বছর আগে ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, M. R. C. P. (London) তাঁর 'বিজ্ঞানেব উপকারিতা' প্রবন্ধে[১৯] বলেছিলেন:

> 'ইহা (বিজ্ঞান) দ্বারা নিজের, স্বজাতির ও স্বদেশের যতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, আর কোন বিদ্যার দ্বারা ততদূর সম্পন্ন হয় না। যিনি বিজ্ঞানসম্ভূত পরম পবিত্র আনন্দরাশি উপভোগ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাকে এই মহাসমুদ্রে রত্নাহরণ জন্য নিমগ্ন হইতে হইবে।...আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতই মনুষ্য বিজ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে, ততই মনুষ্য ধার্মিক হইবে।...'

কিন্তু তথাকথিত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ আছে একথা

১৮. নব্যভারত, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১২৯০।

১৯. ঐ ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ঐ, ১২৯৩।

অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। দর্শনের দ্রষ্টব্য বিষয় বিশ্ব জগৎ। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে দর্শন সমগ্র বিশ্বকে উপলব্ধি করতে চায়। এই জটিল প্রশ্নটি নিয়ে অনেক ধর্মগ্রন্থে নানা কাহিনী বলা হয়েছে। বাইবেলে আছে ছ'দিনে এই চরাচর সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে ভগবান বিশ্রাম নিয়েছিলেন। একথা বিজ্ঞান প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করেছে। জীবের আবির্ভাব সম্পর্কেও বাইবেলের মতামত বিজ্ঞান অস্বীকার করেছে। মুসলমান ধর্মগ্রন্থের জগৎ সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা ও হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের কয়েকটি কাহিনীকে বিজ্ঞান দ্বিধাশূন্য চিত্তে অবান্তর বলে ঘোষণা করেছে। এখানেই বিরোধ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ধর্ম ও বিজ্ঞানের কলহে বিজ্ঞানকে সমর্থন করেছে দর্শন। জড়-জগতের উৎপত্তি, জীবের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে দর্শনের বিরোধিতা প্রায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে তখন দর্শন তার সঙ্গে একমত নয়। বিজ্ঞান তার যুক্তিসিদ্ধ আবিষ্কারের সাহায্যে ধর্মের ভুল সংশোধন ক'রে দেয়, তাকে কুসংস্কার বিমুক্ত করে। দর্শন আবার ধর্মের সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে বিজ্ঞানের অপূর্ণতা দূর করে। স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে এক সুন্দর ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখে তিনি বিশেষ পুলকিত হতেন। এক পত্রে স্বামীজী লিখেছেন[২০] :

> 'আমাদের বন্ধু (কোন বিখ্যাত তড়িৎ তত্ত্ববিদ্)* বেদান্তোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন ; তাঁহার মতে একমাত্র এই সকল মতই আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য।

---

২০. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (ভগিনী নিবেদিতা)। অনুঃ স্বামী-মাধবানন্দ, উদ্বোধন পৃঃ ৩৭৬—৩৭৭।

*নিকোলা টেস্‌লা [স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী অধ্যায় দ্রঃ]।

আবার প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্টি মহৎ বা ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। তিনি মনে করেন যে, তিনি গণিত-শাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রাণ ও জড়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে।...

তাহা হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। আমি এক্ষণে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাইতেছি এবং একটি সবলভাবে প্রতিপাদিত হইলেই অপরটিও হইয়া যাইবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। তাহার প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদান্তিক মতসমূহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইবে।
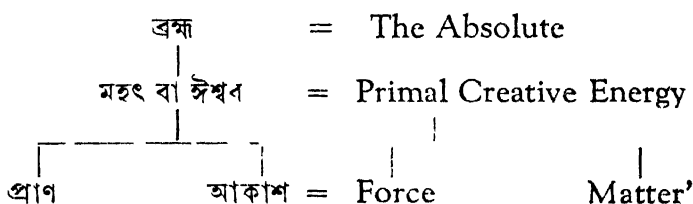
স্বামীজী বলতেন, 'বিজ্ঞানের শক্তি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র।'

এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ আছে। স্বামীজী কি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বেদান্তের প্রতিধ্বনি মনে করেছেন? যদি তিনি তা ক'রে থাকেন তাহলে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সহজ হয় না। যেহেতু বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ত্ব বেদান্ত বা ঐ জাতীয় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় না।

বেদ বলেন, সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। যদি এমন এক সময়ের কথা ভাবা যায় যখন কিছুই ছিল না, তখন এই সব ব্যক্ত শক্তি কোথায় ছিল? কেউ বলবেন, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে ছিল। তাহলে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর বিকারশীল। তাহলে ঈশ্বরের মৃত্যু আছে। কিন্তু তা অসম্ভব। কাজেই এমন কোন সময় ছিল না যখন সৃষ্টি ছিল না। অতএব সৃষ্টি অনাদি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই-ই অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তি স্বরূপ—নিত্য সক্রিয় বিধাতা।[২১] তাঁরই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা থেকে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হচ্ছে, কিছুকাল চালিত হচ্ছে আবার তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু বালক আবৃত্তি করে--'সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'--অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এই কথাটিকে বিজ্ঞানের ছাত্র মেনে নিতে দ্বিধা করলেও স্বামীজী বলেন, 'ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত' (হিন্দুধর্ম, রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫)। এখানে একটা কথা ভেবে দেখার মতো, বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। যদিও এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী রকম ফেরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সে যাই হোক, সৃষ্টির যে তত্ত্ব এখানে বলা হ'ল তার সঙ্গে আধুনিক

২১. 'অদ্বৈত বেদান্ত মতে ঈশ্বরের ধারণা বা সত্তা দু'রকমের: (১)—কারণ শক্তি সহকৃত ব্রহ্ম=অব্যক্ত ঈশ্বর। এখানে ঈশ্বর সক্রিয় নন, তবে সক্রিয় হবার শক্তি সেখানে অব্যক্তভাবে বা কারণাকাশে সুপ্ত, এবং (২)—কার্য-শক্তি সহকৃত ব্রহ্ম=হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—যিনি আসলে সৃষ্টি করেন বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং এই হিরণ্যগর্ভ—ঈশ্বর সেই ঠিক ঠিক নিত্যসক্রিয় বিধাতা বলা যায়।'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

মতবাদের বেশ মিল দেখা যায়। অবশ্য 'ঈশ্বর' কথাটি বাদ দিয়ে। গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় তা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

'হিন্দুধর্ম' বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ সর্বদাই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। স্বামীজীর সমসাময়িক হরিপদ মিত্র বলেছেন, 'বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মতো আব কাহাকেও দেখা যায় নাই।'[২২]

স্বামীজী বলতেন,[২৩] চেতন, অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখতে লাগল, তাদের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন জিনিস মনে ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচাব ক'রে ঐ সমস্ত জিনিসগুলি ৯৩টি মূলদ্রব্যে* (element) থেকে উৎপন্ন হয়েছে ব'লে স্থির করলো।

> হরিপদ মিত্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন[২৪], 'ঐ মূল দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (Compoud) বলে এখন অনেকের সন্দেহ হচ্ছে। আর যখন রসায়নশাস্ত্র (chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদ মাত্র বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে

২২. হরিপদ মিত্র: স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন, স্বামীজীব বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪

২৩. ঐ ”

* স্বামীজীর এই আলোচনাব পরে আজ পর্যন্ত ১০২টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইলেকট্রন তত্ত্ব পরমাণু তত্ত্বের প্রাচীন ধারণাকে আমূল পরিবর্তিত করেছে।

২৪. হরিপদ মিত্র: স্বামীজির সহিত কয়েকদিন, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪।

জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্প বিস্তর চৈতন্য[২৫] আছে।'

পৃথিবীতে যে উঁচু-নীচু জমি দেখা যায়, সেগুলিও ক্রমে সর্বদা সমতল হয়ে একভাবে পরিণত হতে চেষ্টা করছে। বর্ষার জলে পর্বত প্রভৃতি উঁচু জমি ধুয়ে গিয়ে গহ্বরগুলি পূর্ণ ক'রে দিচ্ছে পলিমাটিতে। একটা গরম জিনিস কোন জায়গায় রাখলে তা ক্রমে চারপাশের জিনিসগুলিকে গরম করে, নিজে কিছু তাপ হারায়, পরিশেষে সবাই একই উষ্ণতা বিশিষ্ট হয়। তাপশক্তি এভাবে সঞ্চালন, সংবাহন ও বিকিরণ পদ্ধতির সাহায্যে সবদা সমভাব বা একত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গাছের ফল, ফুল, পাতা, শিকড় ভিন্ন মনে হলেও বাস্তবিক তারা এক—একথা বিজ্ঞান বলে। ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে (প্রিজম্) এক সাদা রং রামধনুর সাতটা রঙের মতো পৃথক পৃথক বিভক্ত দেখায়। সাদা চোখে দেখলে একই রং। আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে সমস্তই লাল বা নীল মনে হয়। কাজেই স্বামীজী বলেন, 'এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক। মায়া দ্বারা

২৫. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে এই যে, স্বামীজী যখন অচেতন পদার্থের চৈতন্যের কথা বলেন তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রচারিত 'তাড়িত প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ' (Response of Inorganic Matter to Electric currents) তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি।

আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরতে পারে না, দেখতে পায় না।'[২৬]

অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হ'লে কি করতে হবে। স্বামীজী বলেন—'হাতেনাতে করতে হবে তবে তার সত্যাসত্য বুঝতে হবে। পাশ্চাত্য রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা তা অনুমোদন করেছে। দু'বোতল হাইড্রোজেন, আর এক বোতল অক্সিজেন নিয়েই যদি প্রশ্ন করা যায়—'জল কই?' তাহলে কি জল পাওয়া যাবে? যাবে না। তাদের একটা শক্ত জায়গায় পুরে তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিয়ে তাদের মিশ্রিত করতে পারলে জল হবে। তখন বোঝা যাবে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস থেকে উদ্ভূত। অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করবার ক্ষেত্রেও তাই। 'অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়।'

প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ কি? তা কখনো যুক্তিবিরোধী হবে না। স্বামীজী বলেন, সকল যোগ এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন রাজযোগ—তা মনস্তত্ত্ব বিষয়ক যোগ। মনোবৃত্তির সহায়তায় পরমাত্ম-যোগে পৌঁছার উপায়। জ্ঞানলাভ করবার একটি উপায় আছে তা হ'ল একাগ্রতা। একেবারে নীচু শ্রেণীর মানুষ থেকে সর্বোচ্চ 'যোগী' পর্যন্ত সবাইকেই এই একই উপায় নিতে হয়। তা হচ্ছে একাগ্রতা। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন[২৭]—

> 'রসায়নবিদ্ যখন তাঁর পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁর মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, তাকে এককেন্দ্রিক করেন এবং সেই শক্তিকে পদার্থ

২৬. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫।

২৭. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

বিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন ঐ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও এইভাবে তিনি তাদের জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতির্বিদ্ও তাঁর সমস্ত মনঃশক্তিকে সংহত ক'রে তাকে এককেন্দ্রিক করেন, তারপর দূরবীনের সাহায্যে ঐ শক্তিকে বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন; তখন নক্ষত্র-নিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘুরে তাঁর দিকে আসে ও নিজ নিজ রহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করে।··যেখানে কোন লোক কোন বিষয় জানার চেষ্টা করছে, তাদের সকলের পক্ষেই এমন ঘটে থাকে।'

এই কারণেই তিনি বলেন, যে কাজে মনের সংযোগ বেশী সেই কাজ তত ভালভাবে হবে। একাগ্রতাশক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে একথাই বলা হয়েছে। আমাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা এত বিক্ষুব্ধ ও নানা-চিন্তায় আলোড়িত যে, মন নানাদিকে ছুটে যায়। তাকে বশে আনতে পারা যায় কি ক'রে তা আলোচিত হয়েছে 'রাজযোগে'।

'আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি' অধ্যায়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন, তা' যেমন মনোগ্রাহী, তেমনি বিস্ময়কর। এমনি চমকপ্রদ ঘটনা ছড়ানো রয়েছে তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র। ধর্ম, দর্শন যা কিছুই তিনি বলতে গেছেন সেইখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মন পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা। পরবর্তী অধ্যায়ে ক্রমবিকাশবাদ ও সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে স্বামীজীর মতামত আলোচনা করবার সময়ে এই 'মনের' পরিচয় আরো গভীরভাবে পাওয়া যাবে।

বিবেকানন্দ ও ক্রমবিকাশবাদ

ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব ক্রমবিকাশবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। ডারউইন, লামার্ক, মেণ্ডেল, হাক্সলি, হলডেন, সার্ডিন, সিম্পসন সকলেই নিজ চিন্তার মৌলিকত্বে বিশ্বাসী। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে। বেদ, উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ আছে। ঋষিরা নানা সময়ে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব চিন্তার কথা প্রকাশ ক'রে গেছেন। কপিল ও পতঞ্জলি তাঁদের দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে যা বলে গেছেন তার সঙ্গে নিজের প্রজ্ঞা ও অনুভূতি মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব মতবাদ —ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে।

ঐতরেয় উপনিষদে (৩।৩) বলা হয়েছে, জীব চার রকমের। যেমন—অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৩) স্বেদজ বাদ দিয়ে তিন রকম জীবের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সমন্বয় রক্ষা করবার জন্য বেদান্তসূত্র (৩।১।২১) স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। প্রাচীন ঋষিরা মনে করতেন সৃষ্টি তিন প্রকারের—প্রাকৃত, বৈকৃত অথবা বৈকারিক এবং উভয়াত্মক। ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

প্রাকৃত সৃষ্টি

প্রথম : মহৎ (ভগবানের সকাশ থেকে গুণ সমূহের বৈষম্য)।
দ্বিতীয় : অহংকার (এ থেকে দ্রব্য—জ্ঞান—ক্রিয়া প্রকাশিত)।
তৃতীয় : পঞ্চতন্মাত্র (ভূত সূক্ষ্মের উদ্ভব)

চতুর্থ : জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়।

পঞ্চম : মন।

ষষ্ঠ : অবিদ্যা (এ থেকে জীবগণের মোহ জন্মে)

বৈকৃত বা বৈকারিক সৃষ্টি।

সপ্তম : স্থাবর বা প্রধান সৃষ্টি

ক. বনস্পতি।

খ. ওষধি।

গ. লতা।

ঘ. বাঁশ।

ঙ. বীরুধ্ (কঠিন লতা)।

চ. গাছ (ফুল হয়ে যাব ফল হয়)

অষ্টম : তির্যগ্ (এরা ভবিষ্যৎজ্ঞান শূন্য, তমোজ্ঞান সম্পন্ন, দীর্ঘানুসন্ধানবিহীন, কেবলমাত্র আহারাদিতে তৎপর)।

ক. দ্বিশফ (গরু, ছাগল প্রভৃতি দুই খুর সমেত জন্তু)।

খ. একশফ (ঘোড়া, চমরী ইত্যাদি এক খুব সমেত জন্তু)।

গ. পঞ্চনখ (কুকুর, শেয়াল, বেড়াল ইত্যাদি)।

ঘ. জলচর (মকর, মাছ ইত্যাদি)।

ঙ. খেচর (শকুনি, বক, শ্যেন ইত্যাদি)।

নবম : মানুষ।

উভয়াত্মক সৃষ্টি

দশম : সনৎকুমার প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদি।

বিবর্তন সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের ধারণা সংক্ষেপে বলা হ'ল। এবারে আমরা মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করবো। স্বামী-বিবেকানন্দ ডারউইনের ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব গভীরভাবে অনুধাবন ক'রে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন। বিশেষতঃ 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রে ডারউইনের বক্তব্যের

সঙ্কীর্ণতার দিকটা দেখান। পাতঞ্জল দর্শনে ডারউইনের বক্তব্যের সমর্থন নেই বলেই যে, তিনি তা গ্রহণ করেননি তা নয়। বিচার ক'রে দেখেছেন, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বলেছেন ক্রটি সমূহের কথা। এবং নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা এতদিন ধরে অবহেলিত হয়েই ছিল। যদিও তাঁর বেঁচে থাকা-কালীন তিনি তাঁর বাগ্মীতার সাহায্যে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রে ফেলতে পারতেন, কিন্তু সেই কালে তাঁর ক্রমবিবর্তনবাদ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি। তাঁর দেহাবসানের অনেকদিন বাদে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ বায়োলজিষ্টদের কাছে। দেখা গেল, তাঁদের চিন্তার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের মিল যথেষ্ট। দুঃখের কথা স্বামীজী প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন, তাঁকে দেখা হয়ে থাকে অধ্যাত্মজগতের এক প্রধানরূপে। এ কারণেই তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। স্বামীজীর মত নিয়ে এবার আলোচনা করা হবে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী একবার আলিপুরের পশুশালা দেখতে যান। পশুশালার তৎকালীন অধ্যক্ষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত রামব্রহ্ম সান্ন্যাল তাঁকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ ও তার কারণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

স্বামীজী বলেছিলেন, 'ডারউইনের কথা সঙ্গত হলেও ক্রম-বিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে এটি যে চূড়ান্ত সীমা সা তা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলের আবিষ্কার পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে ডারউইনের বক্তব্যে কঠিন আঘাত এল। তার পরে ক্রমান্বয়ে চলেছে তর্ক-বিতর্ক। সাংখ্য-দর্শনে বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা আছে। নীচু জাতিকে উঁচু জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে জীবন সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, প্রভৃতি যে সব কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, তা যে সব

সময়ে তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করে না, এবিষয়ে স্বামীজী নিঃসন্দেহ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পশুশালার অধ্যক্ষকে বলেন[১] :

'নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন সংগ্রাম), survival of the Fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), Natural selection (প্রাকৃতিক নির্বাচন) প্রভৃতি যে সকল নিয়ম কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল বিষয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ সকলের একটিও উহার কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species থেকে আর এক species-এ পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacle-এর সঙ্গে দিন-রাত struggle করে যে উহা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle এবং competition জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়, তাহলে বলতে হবে, এই evolution দ্বারা সংসারে বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয়।'

এখানে 'জীবন সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যাখ্যাতারা বলেন, খুটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। এবং তা নিঃসন্দেহে কঠোর সংগ্রাম। শিশু জন্মাবার আগেই ভ্রূণ বা বীজ অবস্থায় অনেকটা নির্বাচন হয়ে যায়। তারপরে দেখা যায় একদিকে বংশবৃদ্ধির জন্য যেমন প্রচুর আয়োজন, তেমনি অপরদিকে

১. শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড।

জীবন ধারণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা। প্রাণ-ধারণের জন্য জাতিগত ও ব্যক্তিগত যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে তাকেই ডারউইন বলেছেন, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম।

ডারউইনের 'সংগ্রাম' কথাটি বেশ জটিল। সংগ্রাম কথাতে বোঝায়—প্রত্যক্ষ ও সজ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সংগ্রাম প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গেলর্ড সিম্পসন বলেছেন[*] যে, এই সংগ্রামেব সঙ্গে 'ডিফারেন্সিয়াল রিপ্রোডাকসন' কিছু পরিমাণে জড়িত।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি পুমা ও একটি হরিণ সংগ্রাম করতে পারে। একটি হত্যা করবার জন্য প্রবৃত্ত, অপরটি নিজেকে হত না করবার জন্য সংগ্রামে রত। যদি পুমা জয়লাভ করে, তাহলে হরিণের মাংস খাবে। এই 'আহার' তার সন্তান উৎপাদনের সহায়ক। অন্যদিকে হরিণ মরে গেল এবং সে আর সন্তান সৃষ্টি করতে পারলো না। তবে একথাও বলা যেতে পারে, যে হরিণটি পুমার সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হ'ল সে হয়ত এত বয়স্ক হয়েছিল যে, তার হয়ত প্রজনন ক্ষমতা আর ছিল না। যদি পুমা হেরে যায় তাহলে সে হয়ত অন্য খাদ্যের সন্ধানে যাবে। সিম্পসন বলেন যে, এই সব ঘটনাবলী থেকে আমরা অনুভব করতে পারি—

> 'To generalise from such incidents that natural selection is over-all and even in a figurative sense the outcome of struggle is quite unjustified under the modern understanding of the process. Struggle is sometimes involved, but it is usually not, and when it is,

it may even work against rather than toward natural selection.'[৩]

ডারউইনের 'struggle for existence' কথাটি জটিল এবং ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে একথা আগেই বলা হয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণী-বিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলি স্বীকার করেছেন যে, ডারউইনের এই বক্তব্য ভ্রম-উৎপাদক। 'জীবন-রক্ষার জন্য সংগ্রাম' বললে একটা কথা মনে হবে—হয় 'জীবন' না হয় 'মৃত্যু'। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। ডারউইন নিজেই যে সব সময় এই বক্তব্যটিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে পেরেছেন তা নয়। সার জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন[৪]—

'...This strange error springs, I would guess, from his failure—perhaps inevitable at the time—to think quantitatively on the subject, coupled with his adoption of the phrase 'the struggle for existence', with its implications of an all-or-nothing competition, life or death. If he had ever spelled out natural selection is modern terms, as being the result of the differential reproduction of variants, he would at once have seen that any form of selection can vary in vigour according to circumstances...

Strangely enough, elsewhere Darwin drops his all-or-nothing view and assumes a differential action of natural selection. This is, so far as I know, the one major point which he

৩. Ibid.

৪. Sir Julian Huxley: 'The Emergence of Darwinism', Evolution After Darwin, vol I; P. 14.

failed to think out fully and on which he expressed divergent conclusions.'

স্ব-শ্রেণীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে থাকে এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তা সমগ্র প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক। হলডেনও একথাকে স্বীকার করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এমনকি স্ব-শ্রেণীর মধ্যে 'নির্বাচনের' ক্ষেত্রেও সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবশ্যক নয়। বরং সহ-অবস্থানের নীতি দেখতে পাওয়া যায়। '.. Selection in favour of harmonious or co-operative group association, is certainly common.'[৫]

স্বামীজী বলেন যে, প্রকৃতির অভিব্যক্তির নীচুস্তরগুলিতে যাই হোক, উঁচুস্তরগুলিতে কিন্তু প্রতিবন্ধকসমূহের সঙ্গে দিন-রাত যুদ্ধ করেই যে তাদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়। দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান, ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের সাহায্যে প্রতিবন্ধকসমূহ স'রে যায় অথবা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। কাজেই বাধাগুলিকে আত্মপ্রকাশের কাজ না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেছেন যে, হাজার পাপীর প্রাণ সংহার করে পৃথিবী থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা করা হ'লে জগতে পাপ বাড়বে ছাড়া কমবে না। এর ফলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, পাশ্চাত্যের 'জীবসকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতি লাভ'-রূপ মত মানবসমাজের অহিতকর। স্বামীজী বলতেন, নীচু প্রাণীকুলে ডারউইনের নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানবজগতে

যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সেখানে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

ডারউইনের ত্রুটি এই যে, তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব-জন্তুদের বিবর্তনকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম ফল মানুষ, তাহলেও তিনি ঐ মৌল দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিলেন বলে মনে হয়। অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে বিচার করেছেন সমদৃষ্টিতে। সার জুলিয়ান হাক্সলি ডারউইনের এই ত্রুটি ও তার কারণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে[৬]। এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ের (Origin of species এবং The Descent of Man) নাম হওয়া উচিত যথাক্রমে—'The Evolution of Organism' এবং 'The Ascent of Man'।

যাঁদের আমরা আদর্শ বলে জানি, তাদের মধ্যে বাহ্য সংগ্রাম প্রায় একেবারেই দেখা যায় না। একথা সত্য যে, মানুষ যত উন্নত হয়, তার জ্ঞান ও বুদ্ধির তত বিকাশ ঘটে। মানবেতর বা নীচু প্রাণিজগতে পরের ধ্বংসসাধন ক'রে উন্নতি করা সম্ভব কিন্তু মানব সমাজে তা চলে না। ত্যাগের মধ্যেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ। যে লোক পরের জন্য যত ত্যাগ করতে পারেন, মানবসমাজে তিনিই তত বড়ো। নীচু জগতে এর বিপরীত—সেখানে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত শক্তিশালী জানোয়ার বলে স্বীকৃত হয়। এ কারণেই ডারউইনের জীবন সংগ্রামতত্ত্ব উভয়রাজ্যে সমানভাবে

---

৬. Sir Julian Huxley : 'The Emergence of Darwinism' (Evolution after Darwin vol 1). P. 16-17.

প্রযোজ্য হ'তে পারে না। স্বামীজীর বক্তব্য আরো বিস্তৃতভাবে তুলে ধরছি[৭]—

'Animal kingdom বা নিম্ন-প্রাণিজগতে আমরা সত্যসত্যই Struggle for existence, Survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারউইনের theory কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human Kingdom বা মনুষ্যজগতে, যেখানে rationality-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। যাঁদের আমরা really great men বা ideal বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality-র বিকাশ। এই জন্য animal kingdom-এর ন্যায় rational human kingdom-এ পরের ধ্বংসসাধন ক'রে progress হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution একমাত্র sacrifice দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice করতে পারে মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়। সুতরাং struggle theory-এ উভয় রাজ্যে equally applicable হ'তে পারে না। মানুষের struggle হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle পরিলক্ষিত

---

৭. শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী: স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড।

হয়, human plane of existence-এ মনের উপর আধিপত্য লাভের জন্য বা সত্ত্বগুণসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle বিপরীত দেখা যায়।'

জীবের নিম্নতম বিকাশ থেকে মানব পর্যন্ত—সর্বত্রই প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আত্মা বিকশিত হচ্ছে। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত আছে। ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করছে। এ বিষয়ে স্বামীজী বলেছেন[৮] :

বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করিবার সংগ্রাম। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করিয়া নয়, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই মানুষ আজ বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা রক্ষা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, ঐ বৃক্ষ—ইহারা সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা—মৃত্যু। মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা

---

৮. প্রকৃতি ও মানুষ : জ্ঞানযোগ।

নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি, প্রকৃতির অনুগত হইয়া নয়।

ক্রমবিবর্তনবাদীরা যে মনে করেন, ছোট মাংসল জন্তু বিশেষ (mollusc) থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের, স্বামীজী তা স্বীকার করেন না। হাক্সলি বা ডারুইন অথবা পোষ্ট্ ডারুইনিয়ানদের ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব তিনি খুব গভীরভাবে পড়েছেন কিনা জানা নেই। তবে অন্ততঃ কয়েকটি জায়গাতে তিনি যে যথার্থ মন্তব্য করতে সক্ষম হন নি বা তাঁর মতামত যথার্থ নয় তার বেশ ভাল প্রমাণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন, পুরাণের মধ্যেই ক্রমবিবর্তনতত্ত্বের সঠিক (তাঁর মতে) ব্যাখ্যা পেয়েছেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় পুরাণ মতে সব ধরনের উন্নতিই তরঙ্গাকারে হয়ে থাকে। প্রতিটি তরঙ্গ একবার ওঠে আবার পড়ে যায়। তারপরে আবার ওঠে, আবার পড়ে। এমনিভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রতিটি গতি চক্রাকারে হয়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও দেখা যাবে যে, সহজ সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ সৃষ্টি হ'তে পারে না। তাঁর মতে যদি ক্রমবিকাশের কথা বলা হয়, তাহলে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াকেও ধরতে হবে। স্বামীজীর কথায়ঃ

> বিজ্ঞানবিদ্‌ই বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণ প্রয়োগ কর, উহা হইতে সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পারো। অসৎ (কিছু না) হইতে সৎ (কিছু) কখনো হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব, খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তু বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রম-সঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ঐ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে তো কখন সৎ-এর উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে-শক্তি ধীরে

ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল; এবং যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মোলাস্ক বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ পর্যন্ত গিয়া উহাকেই আদি কারণ স্থির করিয়া থাকো, তবে ইহা নিশ্চিত যে, ইহাতেও ঐ শক্তি কোন না কোনরূপ অবস্থিত ছিল।'[৯]

স্বামীজীর মতে ক্রমবিকাশবাদের মধ্যে দু'টি ব্যাপার আছে। একটি এই যে, এক প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হচ্ছে, আর বাইরের ঘটনা তাকে বাধা দিচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না। সুতরাং এই অবস্থাসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ঐ শক্তি নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হওয়ার চেষ্টায় আর একটী শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় ক'রে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মানুষে পরিণত হয়। যদি এই তত্ত্বটিকে তার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এমন সময় আসবে যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে খেলা করছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত মানুষরূপে পরিণত হয়েছে, তা সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে, বাইরের ঘটনাবলী তাকে আর কোন বাধা দিতে পারবে না।

বিবর্তনতত্ত্ব বোঝানোর জন্য তিনি একটি উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যে গাছ আমরা দেখছি তা এল কোথা থেকে। নিশ্চয় বীজ থেকে। সমগ্র গাছ বীজের মধ্যে বর্তমান ছিল। এই গাছটি তা থেকে ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। আবার তা সূক্ষ্মরূপে যাবে এবং পরে

---

৯. মানুষের যথার্থ স্বরূপ (১): জ্ঞানযোগ।

কালক্রমে তা আবার প্রকাশিত হবে। তাহলে বোঝা গেল যে, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হয়ে স্থূল ও স্থূলতর হয় যতদিন না তারা চরম সীমায় পৌঁছে। চরম সীমানায় উপস্থিত হ'লে তারা আবার সূক্ষ্মতর অবস্থায় নীত হয়।

> 'এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি কেবল যেন উহাদেব অংশগুলির অবস্থান পরিবর্তন ইহাকেই বর্তমানকালে 'ক্রমবিকাশবাদ' বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 'ক্রমবিকাশ'বাদীদের সহিত বিবাদ কবিবেন না।'[১০]

একথা বলা হয়েছে যে, স্বামীজী ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচের অস্তিত্বে আস্থাশীল। তিনি মনে করতেন যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আগেই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া আছে। উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন -বীজ থেকে গাছ জন্মে বটে, কিন্তু ঐ গাছ আবার বীজ উৎপন্ন করে। বীজ সেই সূক্ষ্মরূপ যা থেকে বড় গাছটি এসেছে, আবার আব একটা প্রকাণ্ড গাছ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হয়েছে। সমগ্র গাছটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য থেকে কোন গাছ জন্মাতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখছি গাছ থেকে বীজ উৎপন্ন হয় আর বিশেষ বীজ থেকে ঐ নির্দিষ্ট গাছ-ই জন্ম গ্রহণ করে, অন্য কোন গাছ হয় না। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেই গাছের কারণ ঐ বীজ—শুধুমাত্র ঐ বীজটিই আব তার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র গাছ। সমগ্র মানুষ একটি জীবাণুর মধ্যে আবার ঐ জীবাণু ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয়ে মানুষের আকারে পরিণত হয়েছে। স্বামীজী

১০. জগৎ (বহির্জগৎ): নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড।

বলেন যে, ক্রমবিকাশবাদ সত্য হ'লে একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান। তাঁর কথায়[১১] :

> 'যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের (Darwin's Evolution) সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই।'

এই ক্রমসঙ্কোচ বা involution-এর কথা বিখ্যাত বিজ্ঞানী Pierre Teilhard De Chardin (পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন)-এর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন যে, মানুষের মধ্যে 'existence of a "with in" can no longer be evaded,' যেহেতু 'it is the object of a direct intuition and the substance of all knowledge.'[১২]

এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সার্ডিনের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন[১৩]—

> 'It is impossible to deny that, deep within ourselves, an "interior" appears at the heart of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that, in one degree or another, this "interior" should obtrude itself as existing everywhere in nature from all time. Since the stuff of the universe has an inner aspect at one point of itself, there is

---

১১. 'জগৎ (বহির্জগৎ,') জ্ঞানযোগ।

১২. The Phenomenon of Man,London Collins, 1959, P, 55.

১৩. ibid, P, 56.

necessarily a "double aspect to its Structure," that is to say, in every region of space and time—in the same way, for instance, as it is grannular : *"Coextensive with their without, there is a Within to things."*

অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের কথা ডারউইন স্বীকার ক'রলেও স্পষ্ট ক'রে বলেননি। তা ছাড়া ক্রমসঙ্কোচের কথা তিনি হয়ত ভাবতেই পারেননি। মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের বিশেষত্ব এই সব ধর্মে[১৪]—

(1) The decisive emergence in individual life of factors of internal arrangement (invention) above the factors of external arrangement (utilisation of the play of chance)

(2) The equally decisive appearance between elements of true forces of attraction and repulsion (sympathy and antipathy), replacing the pseudo-attractions and pseudo-repulsions of pre-life or even the lower forms of life, which we seem to be able to refer back to simple reactions to the curves of space-time in the one case, and to the biosphere in the other.

(3) Lastly, the awaking in the consciousness of each particular element (Consequent upon

১৪. Pierre Teilhard De Chardin : The Phenomenon of Man, Harper & Brothers Publishers, N.Y 1959, P, 302-303.

its new and revolutionary aptitute for foreseeing the future) of a demand for 'unlimited survival'. That is to say the passage, for life, from a state of relative irreversibility (the physical impossibility of the Cosmic involution to stop, once it has begun) to a State of absolute irreversibility (the radical dynamic incompatibility of a certain prospect of total death with the continuation of an evolution that has become reflective).

বিগত ১৯৫৯ সালে ডারউইনের বিখ্যাত 'origin of species' গ্রন্থের প্রকাশনার শতবর্ষ উপলক্ষে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। এই বক্তৃতামালার শেষ অধিবেশনে বিখ্যাত বায়োলজিষ্ট সার জুলিয়ান হাক্সলি 'দি ইভোলিউশনারি ভিসন' (The Evolutionary Vision) শীর্ষক একটি বক্তৃতায় ক্রমবিবর্তনতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে স্বামীজীর কথার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

মানুষের ক্রমবিকাশ বায়োলজিকাল নয়, একে বরং মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে; এই প্রক্রিয়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী হয়। তার ফলে আত্মবোধ, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি হয়ে থাকে। শারীরিক বা জৈবিক যন্ত্রসমূহের উপর মানুষের বিবর্তন নির্ভরশীল একথা বললে সত্য বলা হয় না। বরং জ্ঞান, ধারণা, বিশ্বাস, আদর্শবোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলে বিবর্তন হয় মানুষের।

হাক্সলির নিজের কথায়[১৫]--

---

১৫. Evolution After Darwin, vol III, pp 251-2.

'Man's evolution is not biological but psychological ; it operates by the mechanism of cultural tradition, which involves the cumulative self-reproduction and self-variation of mental activities and their products. Accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by breakthroughs to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas and beliefs ideological instead of psychological or biological organization ...'

এই সঙ্গে হাক্সলির আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, 'মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র বস্তু বা পদার্থের উপরে 'মনে'র স্থান। পরিমাণ বা সংখ্যার উপরে গুণের আসন।

'It (Evolutionary vision) shows us mind enthroned above matter, quantity subordinate to quality.'[১৬]

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে দেহের থেকে মনের প্রাধান্য বেশী একথা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও ধরা পড়েছে। প্রতিযোগিতা আছে ঠিক, কিন্তু অপরকে ধ্বংস ক'রে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সাধনা মানুষের নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১৭]—

'অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব

১৬. Ibid.

১৭. যাত্রী।

স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।'...

স্বামীজী বলেছেন, ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া মানুষকে মহত্ত্বর সোপানে পৌঁছে দেয়। তিনি একথাও বলেছেন যে, ক্রমবিকাশ আর কিছুই নয়, এ হলো সেই 'আত্মার' বিকাশ। 'যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃত পক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়।' স্বামীজী আরো বলেছেন[১৮]—

> 'এই সমুদয় ক্রমবিকাশশীল জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণ-মানব—এই—সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে, অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়।'

আশ্চর্যের কথা আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বায়োলজিষ্ট সার জুলিয়ান হাক্সলিও এই কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'The Emergence of Darwinism' প্রবন্ধে[১৯] তিনি বলেছেন যে ক্রমবিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়া।

---

১৮. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড, পৃ ১১৬।

১৯. Evolution After Darwin. (Sol Tax-Ed.) Vol. I, P 20. Univ Chicago Press.

ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের বিবর্তনের চরম উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা বেঁচে থাকবে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে অথবা তার গঠনগত নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে, কিংবা পারিপার্শ্বিকের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়বে; তার উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান থেকে আরো বেশি পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া। তাঁর ভাষায়—

> '...the fuller realization of more possibilities by the human species collectively and more of its component members individually.'

হাক্সলি বলেন, মানুষের চরম লক্ষ্য যদি 'বৃহত্তর পরিপূর্ণতা' ধরা হয়, তাহলে আমাদের এমন এক ধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন (Science of human possibilities) যার সাহায্যে আগামী দিনের (ভবিষ্যতের) 'মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন' (Psychological evolution) সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারবো। তাহলে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বহুকাল আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে 'মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের' কথা বলে গিয়েছিলেন, বর্তমানকালের বিজ্ঞানীদের বক্তব্যে তারই সমর্থন মেলে।

বেদান্ত দর্শন বলেন সমগ্র বিবর্তন ক্রিয়া গাঠনিক ও গুণগত উদ্বর্তন তো বটেই এবং তার চেয়েও বড় কথা অন্তস্থ 'অসীম সত্তা'র বৃহত্তর প্রকাশ। এ হচ্ছে 'বস্তুর' উদ্বর্তন এবং আত্মার বিকাশ। বিংশ শতকের বায়োলজিস্টরা আদি (প্রথম) জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেও চিৎশক্তির বিকাশ লক্ষ্য করেছেন।

চিৎশক্তির আধ্যাত্মিক মান ক্রমে সমৃদ্ধ হতে থাকে, বিভিন্ন দিকে তার প্রকাশ ঘটে যতই বিবর্তনের ধাপ অগ্রসর হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ চিৎশক্তিকে প্রগাঢ় ও ব্যাপক করে তুলতে সাহায্য করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলে।

বিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের পরে চিৎশক্তির এক নতুন ও ইঙ্গিতপূর্ণ দিক টের পাওয়া গেল। মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে চিৎশক্তির বিকাশ ঘটে প্রধানতঃ বাইরেকার পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর ক'রে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশের উপর এই শক্তির বিকাশ খুব বেশি নির্ভর করে না। কেবলমাত্র মানুষ 'নিজেকে' উপলব্ধি করতে পেরেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কশূন্য উভয় সত্তার সম্বন্ধেই সে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল। বিংশ শতাব্দীর বায়োলজি এবং প্রাচীন বেদান্ত উভয়েই মানুষের এই বিশেষত্বকে তার একান্তভাবেই নিজের' বলে ঘোষণা করেছেন। বিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে সঞ্জাত হয়েছে এই বিশেষ শক্তি—চিৎশক্তি, বা আত্ম-জ্ঞান। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত জটিল জিনিস।

বিবর্তন সম্পর্কে বেদান্তের মতামত এবং সেই সঙ্গে মানুষের এই বিশেষত্ব বিষয়ে 'ভাগবতে' এক সুন্দর শ্লোক আছে।

'সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন খগদংশমৎস্যান
তৈস্তৈর তুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ' (১১ : ৯ : ২৮)

—ঈশ্বর তাঁর নিজের শক্তির সাহায্যে (ক্রমবিবর্তন ?) গাছ, সরীসৃপ, পশু, পাখী, কীট প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরের সৃষ্টি ক'রে তাতেও সন্তুষ্ট না হ'তে পেরে শেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানসমন্বিত এই পুরুষদেহ (মানুষ) সৃষ্টি ক'রে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন।

এক চৈতন্যময় অণু থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানব। যেহেতু মানুষের মধ্যে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ। এই কথার প্রকারান্তরে সমর্থন মেলে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী L. S. Berg-এর

বক্তব্যে। তিনি বলেছেন বিবর্তন কেবলমাত্র বহিরঙ্গে নয়, তা অন্তরঙ্গেও। এমন কোন শক্তি গঠনশীল অণু পরমাণুব মধ্যে আছে যা জীবাণুকে তার নির্ধারিত পথে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, বিবর্তন ক্রিয়া যেন পূর্ব পরিকল্পিত। পূর্বেই অবস্থিত কোন সঙ্কুচিত জিনিসের (সত্তা ?) উন্মোচন মাত্র।

তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে বায়োলজি একদিন নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে যে 'intrinsic and constitutional agencies laid down in the structure of protoplasm, which compel the organism to vary in a determined direction.'[২০]

বিজ্ঞানীরা তাঁর এই বক্তব্যের নানা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ মন্তব্য শুনলে স্বামীজীর ধারণার সঙ্গে তার সুস্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন --[২১]

'Evolution is to a considerable degree predetermined, an unfolding or manifestation of pre-existing rudiments.'

বার্গ অনেকদিন আগে (১৯২৬) যে কথা বলেছেন আধুনিক কালের একজন খ্যাতনামা জীবতত্ত্ববিদ্ Theodosius Dobzhansky (কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক) তাঁর এক প্রবন্ধে[২২] [সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত (১৯৫৯)] 'Evolution From within' কথাটাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

যদি স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, ক্রমবিকাশ মানে চৈতন্যের

---

২০. L. S. Berg. 1926. Nomogenesis, London : Constable

২১. Ibid.

২২. Theodosius Dobzhansky : Evolution And Environment [The Evolution of Life : The Univerity of Chicago Press 1960]

বিকাশ, তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো, মানুষ জন্মাবার আগে তো লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে—তখন তো চৈতন্যের অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই বলতে হয়—সেই সময় ব্যক্ত চৈতন্য ছিল না, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল। সৃষ্টির শেষ হচ্ছে পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য। আদিতেও তাই। বর্তমান কালের বিজ্ঞানীর কথায় এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন তাঁর বিখ্যাত 'The Phenomenon of Man' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ক'রে বলেছেন —'consciousness transcends by far the ridiculously narrow limits within which our eyes can directly perceive it'. (p 300)

স্বামীজী অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে আছে—এক আদিম জীবকোষ থেকে ক্রমে ক্রমে এই বিচিত্র জীবদেহ জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে মানবদেহ পর্যন্ত সর্বত্রই আছে 'প্রোটোপ্লাজমিক সেল্'। অবশ্য মানবদেহে এর আকৃতি ভিন্নতর। কারণ মানবের মস্তিষ্কে এই কোষ অত্যন্ত জটিল ব্যূহ রচনা করেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ একটি মাত্র ব্যক্তি নয়, বহু ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠিত। এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তার পৃথক বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংস্কার আছে। ডারুইনও একথা মেনে নিয়ে বলেছেন,

> 'An organic being is a microcosm, a little universe, formed of a host of self propagating organism, inconceivably minute and numerous as the stars in heaven.'

ডারুইন বলেছেন লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের ভিতর দিয়ে জীবকোষকে চলে আসতে হয়েছে। কত অবস্থার বিপর্যয়ে কত পরিবর্তন তাকে আঘাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু নানাবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার জীবনাক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে। অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে স্যামুয়েল বাটলার মন্তব্য করেছেন :

> 'I suppose, that the fish of fifty million years back and the man of today are one single living being in the same sense or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown.'

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকায় বিরাট আকারের টিকটিকি জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এটি পণ্ডিতদের অনুমান। এদের মধ্যে দু'জাতের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিৎদর্শন। আকারে ছিল বিরাট। প্রায় ৯-১০ ফিট। পিঠের উপরে থাকতো বড়ো একটা ডানা। এদের খাদ্য ছিল মাংস। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে ২০ থেকে ১৫ কোটি বছরের মধ্যে এই পৃথিবীর সবগুলি সমুদ্র শুকিয়ে যায়। মাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো কোনো জায়গায় সামান্য জল ছিল—কুমীর জাতীয় একধরনের জীব মাটিতে গর্ত করে কোনরকমে বেঁচে ছিল। আর সব প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুঝতে না পেরে লোপ পেয়েছিল। তারপরে ১৫ থেকে ১০ কোটি বছরের মধ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান ঘটে।

সরীসৃপের চরম উন্নতি দেখা যায় মেসোজোইক মহাযুগে। তখন অতিকায় জন্তুর আধিপত্য। ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস্, ইগুয়ানোডন

প্রভৃতি অতিকায় জন্তুদের ভিতর একটা জিনিস নজরে পড়ে তা হ'লো এদের দৈহিক অব্যবস্থা। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রচুর মালমশলা দিয়ে প্রকৃতি দেবী যেন অ্যামেচারী মূর্তি তৈরী করেছেন। তাই দেখা যায়, যে জন্তু ৭০-৮০ ফিট লম্বা, তার পা অতি সরু। তাই পায়ের উপর দাঁড়াতে অসুবিধা হতো। জীবিকা সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটতো, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার পন্থা তাদের জানা ছিল না। তাই কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে।

ডারুইন বলেন নিজেদেব মধ্যে রেষারেষি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ প্রাণীই বাঁচতে পারে না। সংখ্যা যত বাড়ে, আহারেব অকুলান তত বাড়ে। তাই প্রতিযোগিতা নেয় হিংস্র রূপ। নিজস্ব সত্তা বক্ষার জন্য যাবা উৎরে যায় তারা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুণসম্পন্ন। এই গুণ তাদের বংশপবম্পরায় উৎকর্ষ লাভ করে। ডারুইন একেই বলেছেন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বা survival of the fittest। সংখ্যা যত বাড়ে--জীবন সংগ্রামও তত বাড়ে। যারা সংগ্রামে পটু তারাই বেঁচে থাকে, আর তাদেরই কদর বেশী। যৌন-নির্বাচনও এমনি ধারাতেই হয়। নানারকম বাছাইয়ের ফলে ধীরে ধীরে একটি ধারা অবলম্বন ক'রে জীবজন্তুর পরিবর্তন হয়, উন্নতি হয়।

ডারুইনের এই Theory of Natural Selection মেনে নিলেন না মেণ্ডেল। মেণ্ডেলিয়ানরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললেন যে পবিবর্তন বা variation যে সর্বদাই কোন ধারা অনুসরণ ক'রে চলবে তা নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে যে কোন সময়, আকস্মিক ভাবে কোন বড়ো ধরনের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়, ডে-ভ্রীজ তাঁর মতবাদের নাম দিলের Mutation Theory। তিনি জানালেন যে হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে ঘটে জীবজগতের উন্নতি।

ক্রমবিবর্তন বা উদ্বর্তনবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর মত কিঞ্চিৎ ভিন্ন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ[২৩]

> 'কোনো বস্তুর (বিকাশের কালে) প্রকৃতি পুনরায় জন্মলাভ করে, কার্যগুলি কারণের ভিন্নতর রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কার্যের মধ্যে যাহা ঘটে, তাহার সকল সম্ভাবনাই কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এবং সমগ্র সৃষ্টিই সৃজন নহে, উদ্বর্তন মাত্র'।

ক্রমবিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীন অধিবিদ্যা ও বেদান্তবর্ণিত বিশ্বরূপ তত্ত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বিবেকানন্দ এ কথায় খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন, 'পরিণামবাদ বা ক্রমবিকাশ আমাদের যোগ ও সাংখ্যদর্শনের ভিতর রহিয়াছে'। পতঞ্জলি বলেছেন— 'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ'[২৪]। বিবেকানন্দ জানতেন যে এর কারণ সম্বন্ধে পতঞ্জলির সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। বলা বাহুল্য পতঞ্জলির ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক।

এর মূল ভাবটি হচ্ছে যে আমরা এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছি এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। আমাদের শিক্ষা ও প্রগতির একমাত্র অর্থ হচ্ছে অন্তরায়গুলি অপসারিত করা। তাহলে স্বভাবতই ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাবে। এর দ্বারা জীবন সংগ্রামের মতবাদ (struggle for existence) খণ্ডিত হয় বলে স্বামীজী মনে করতেন। তার মতে জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতাগুলি পথেই অনুভূত হয় এবং সেগুলি নিঃশেষে অপসারিত করা যায়। ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় না অভিজ্ঞতাগুলির। তা না থাকলেও আমাদের অগ্রগতি হবে। বস্তুর স্বভাব বিকশিত হওয়া। যে গতিবেগ সে প্রাপ্ত হয় বা যে প্রেরণার (momentum) বলে

---

২৩. সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭৪

২৪. যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২

সে চলে তা বাইরে থেকে আসে না, তা ভিতর থেকে আসে। প্রত্যেক জীবাত্মা আগে থেকেই কুণ্ডলীকৃত সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলি প্রকাশের অনুকূল পথ পাবে, সেগুলিই বেরিয়ে আসবে।

কাজেই বাইরের বস্তু আমাদের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় আবেষ্টনী ক'রে দিতে পারে। স্বামীজী বলতেন, যে সব প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম ও অশুভ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা ক্রমসঙ্কোচের ফল বা কারণ নয়। তা জীবনের পথে এসে থাকে। সেগুলি না থাকলেও মানুষ অগ্রসর হবে এবং 'ঈশ্বররূপে বিকশিত হইবে, কারণ ঈশ্বরের স্বভাবই বাহির হইয়া আসা ও নিজেকে বিকাশ করা। প্রতিযোগিতার ভয়াবহ ভাবের পরিবর্তে এই ভাবটি আমার অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।'[২৫]

অনেকে বলেন মানুষ যদি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ না করত, তাহলে সে উন্নতি করতে পারত না। কিন্তু—

> 'এখন দেখি যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ মানুষের উন্নতি ত্বরান্বিত না করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া দিয়াছে। একদিন আসিবে, যখন মানুষ নূতন আলোকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং দেখিবে যে প্রতিযোগিতা প্রগতির কারণ বা কার্য কিছুই নয়। প্রতিযোগিতা পথের একটি দৃশ্য মাত্র, ক্রমবিকাশের জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই।'[২৬]

স্বামীজী মনে করতেন যে, পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত একমাত্র সিদ্ধান্ত, যা যুক্তিশীল বিচারশীল মানুষ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য বর্তমান। বিবেকানন্দ যেভাবে হিন্দুশাস্ত্র দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ব্যাখ্যা করছেন তার সঙ্গে আধুনিক প্রকল্পের ব্যবধান

---

২৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শতবর্ষ সং) ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭০

২৬. স্বামীবিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শতবর্ষ সং) ২য় খণ্ড, পৃ৪৭০-৪৭১

আছে। তা নিয়ে আলোচনার আগে স্বামীজীর মতামত আরো ভালভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, পরিবেশগুলি বাধা দিতে পারে, কিন্তু প্রগতির জন্যে তার প্রয়োজন নেই। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, একজন হয়তো পারিপার্শ্বিক অবস্থা জয় করতে পারে, কিন্তু একজনের জয়ের অর্থ হাজার জনকে বিতাড়িত করা। তাঁর মতে একে ভাল বলা চলে না। যা একের সহায়ক এবং অনেকের প্রতিবন্ধক, তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অজ্ঞানতার জন্যেই এইসব সংগ্রাম এখনও রয়েছে। এরা মানুষের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বা তার অঙ্গ নয়। আমাদের অসহিষ্ণুতাই সংগ্রাম সৃষ্টি করে। পথ তৈরী করবার ধৈর্য আমাদের নেই। আমাদের জন্য সমস্ত দরজা খোলা, প্রতি-যোগিতা ও সংগ্রাম ছাড়াই আমরা সকলে বেরিয়ে যেতে পারি। তবুও আমাদের অজ্ঞানতা ও অধৈর্যের জন্য আমরা সংগ্রাম সৃষ্টি করি। স্বামী বিবেকানন্দ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছেন—

'ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে; যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মানুষরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার যখন উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং আধুনিক মতবাদসমূহের সহিত আমাদের বিবাদ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন; ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি ব্যাপারে সাংখ্যমতের সহিত আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের (Physiology) পার্থক্য অতি অল্প।'[২৭]

---

২৭. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং।

ক্রমবিবর্তন বা উদ্বর্তনের প্রকল্প এবং হিন্দু-প্রকল্পের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই--প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির তুলনায় সমগ্র সৌধের একটা অংশ মাত্র। বেদান্তবাদের মধ্যে যে সাময়িক নিবর্তন বা involution রয়েছে, তা উদ্বর্তনবাদের পরিপূরক অংশ। সমস্ত হিন্দুতত্ত্বই তাদের প্রকৃতি অনুসারে চক্রতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অগ্রগতি সেখানে পর পর তরঙ্গপ্রবাহের মতো দেখা দেয়। প্রত্যেক তরঙ্গ ওঠে আবার নামে। প্রত্যেক তরঙ্গের পরে আবার নতুন করে তরঙ্গ আসে। সে তরঙ্গও ওঠে ও নামে। এইকারণেই স্বামীজী বলেছেন : [২৮]

> 'এমনকি আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতেও মানুষ কেবল উদ্বর্তন মাত্র হইতে পারে না। প্রত্যেক উদ্বর্তনের জন্য চাই অনুবর্তন-ও। আধুনিক বিজ্ঞানী বলিয়া দিবেন যে, তুমি কোনো যন্ত্রের মধ্যে যতোখানি শক্তি দিবে, সে যন্ত্র হইতে ততো-খানিই শক্তি তুমি পাইতে পারো। কিছু-না হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষ যদি আদিম মেরুদণ্ডবিহীন কোনো প্রাণীর উদ্বর্তিতরূপ হয়, তবে পূর্ণতম মানুষ, বুদ্ধ মানুষ, খৃষ্ট-মানুষ, তাঁহারাও ঐ আদিম মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধ্যে নিবর্তিত হইয়াছিলেন। এইভাবে আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি। পূর্ণতম মানুষের রূপ লাভ না করা পর্যন্ত যে শক্তি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা শূন্য হইতে আসিতে পারে না। এই শক্তি কোথাও না কোথাও বিদ্যমান ছিল। এবং যদি জীবকণায় গিয়া তুমি ইহার সূত্রপাত লক্ষ্য কর, তবে ঐ জীবকণাতেই নিশ্চয় সেই শক্তি বিদ্যমান ছিল।'

২৮. জ্ঞানযোগ।

জ্ঞানযোগ সংক্রান্ত একটি বক্তৃতায় তিনি উদ্‌বর্তন-নিবর্তন ধারণাকে একটি বিস্ময়কর রূপ দেন। তাঁর মত অনেকাংশে ওয়েলসের বিপরীত উদ্‌বর্তনের সমধর্মী। তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—

'আমরা যদি জন্তু-জানোয়ার হইতে উত্থিত হইয়া থাকি, তবে জন্তু-জানোয়ারও অধঃপতিত মানুষ হইতে পারে। কেমন করিয়া জানিলেন যে, তাহা নহে? আপনারা কতকগুলি ধারাবাহিক দেহ লক্ষ্য করিয়াছেন, সেগুলি ক্রমেই উন্নততর হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে আপনারা কেমন করিয়া জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন যে, উহা কেবল নিম্নতর হইতে উচ্চতর হইয়াছে, কখনও উচ্চতর হইতে নিম্নতর হয় নাই?......আমি বিশ্বাস করি, এই ধারাবাহিকতা বারে বারে নীচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নীচে উঠা-নামা করিতেছে।'

সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই চেতন ও অচেতন এই দু'ভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর নিজের মতো রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন, আবার কেউ বলেন যে, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ। অনেকে আবার বলেন, মানুষেরই কেবল বিচারশক্তি আছে, তার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশি। যা হোক, এ বিষয়ে কারো মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ যে সব বস্তু সৃষ্ট হয়েছে সেই সব পদার্থের অংশ মাত্র। এবারে প্রশ্ন হলো—সৃষ্ট পদার্থ বলতে আমরা কি বুঝি? স্বামীজী বলেছেন যে এ বোঝার জন্যে একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন ক'রে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতের মাটিতে শরীর রক্ষার জন্য অতি অল্প সময় ব্যয় ক'রে কৌপীন প'রে বিচার করতে লেগে গেলেন--এমন জিনিস কি আছে, যা জানলে সব জানা হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে নানারকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দু'দলই ক্রমে এক জায়গায় হাজির হয়েছেন এবং এক কথাই বলছেন। উভয়পক্ষই বলছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ এক অনির্বচনীয় অনাদি বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল (Time) এবং দেশ (Space) ও তাই।

স্বামীজীর কথায়—[২৯]

'কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়; ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য থাকিবে না।* ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ (space) বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মতো অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তু বিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা

২৯. হরিপদ মিত্র : স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন,

* Sir James Jeans লিখিত 'The Dying sun' প্রবন্ধ দ্রঃ। স্বামীজীর এই বক্তব্য Jeans-এর আগে।

হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তারও তো সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক; তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভবে না। তাই ঐ সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই ঐ-সকলরূপে প্রকাশিত।'

স্বামীজীর মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তা সজোরে বলেছেন। জড়বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করবেন না, যদিও কোন কোন বিজ্ঞানী সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল রহস্য উন্মোচিত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত 'vital force'-এর শরণ নিয়েছেন। অনেকে আবার প্রকারান্তরে ভগবানের কথাও বলেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিসংক্রান্ত যে সব তত্ত্ব এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার কোনটিই রহস্যের মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হয় নি।

ইতিপূর্বে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার সময় সংকোচন-প্রসারণ তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। স্বামীজী দেখিয়েছেন যে সাংখ্য মতেও সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসংকোচের কথা বলা হয়েছে।

Nature -যাকে বাংলায় বলা হয় 'প্রকৃতি', স্বামীজী তাকে বলেছেন 'অব্যক্ত'। তাঁর মতে এটিই অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম। অব্যক্ত হচ্ছে যা ব্যক্ত নয়, এ থেকেই সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে। এ থেকেই অণু-পরমাণু এসেছে। প্রাচীন আচার্যগণ বলেছেন, অব্যক্ত হচ্ছে তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এর সম্মিলিত রূপ।

প্রাচীন দার্শনিকদের অনেকে বলেছেন যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কিছু দিনের জন্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ মনে

করেন ব্রহ্মাণ্ডের অংশ বিশেষে এই প্রলয় সংঘটিত হয়। স্বামীজী দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন[৩০]—

'মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে—এই মতটিরই অধিক পক্ষপাতী।'

স্বামীজী ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচের যে বিবরণ দিয়েছেন আধুনিক মতবাদের সঙ্গে তার মিল আছে। তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানে যাকে জড় বস্তু বলা হয় হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদেরা তাকে 'ভূত' বলেন। এ-ই 'আকাশ' নামে অভিহিত। 'ইথার' বললে আমরা যা বুঝি, 'আকাশ' অনেকটা সেই রকম। 'আকাশ' হচ্ছে আদিভূত। এ থেকেই যাবতীয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হয়েছে। এর সঙ্গে 'প্রাণ' থাকে। প্রাণ হচ্ছে গতি বা স্পন্দন। যা কিছু দেখতে পাই তা এই প্রাণের বিকার এবং জড় বা ভূত-পদার্থ যা কিছু আমরা জানি, যা-কিছু আকৃতিযুক্ত বা বাধাদান করে, তা এই আকাশেরই বিকার। বিবেকানন্দ সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে প্রাণের বারবার আঘাতে আকাশ থেকে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, তা থেকে বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ কমে শীতল হতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, তাকে 'অপ্' বলে; অবশেষে তা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। তার নাম 'ক্ষিতি' বা পৃথিবী। সবচেয়ে আগে আকাশের

৩০. ধর্মবিজ্ঞান, সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব।

স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর তা তরল হয়ে যাবে, আর যখন আরো ঘনীভূত হবে, তখন তা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করবে। ঠিক এর বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তুনিচয় তরল পদার্থে পরিণত হবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হবে। এগুলি আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয়ভাব ধারণ করবে। পরে পরমাণুসকল বিশ্লিষ্ট হতে আরম্ভ হয় এবং সবশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য-অবস্থা উপস্থিত হয়।

এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদ একবার উপস্থিত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিজ্ঞানীরা বলেন কোটি কোটি দলবাঁধা নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে বিশ্বজগৎ। আমাদের সূর্য তাদেরই অন্তর্গত একটি নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় নক্ষত্রগুলি স্থির হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আলোর বর্ণালী পরীক্ষায় জানা গেছে যে, কোন নক্ষত্র স্থির হয়ে নেই, তারা ক্রমাগত ছুটে চলেছে। একটি নক্ষত্র থেকে আর একটির দূরত্ব বা ব্যবধান কোটি কোটি মাইল। তাই তাদের পক্ষে পরস্পরের কাছে চলে আসা অতি বিরল ঘটনা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার জেমস্ জীনস্ অনুমান করেছিলেন এই বিরল ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে।

একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র ভেসে এসেছিল সূর্যের খুব কাছে। এই বিরাট আকৃতির নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের মধ্যে উত্থিত হলো এক প্রচণ্ড ঢেউ। তা জ্বলন্ত বাষ্পের। আগন্তুক নক্ষত্রটি সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে লাগলো, ঐ তরঙ্গও তত প্রবল হয়ে উঠলো। ক্রমে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিবাষ্পের টানাসূত্র (Filament) সূর্যের পিঠ থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হলো আগন্তুকের দিকে। টানাসূত্রটি

অনেকটা পটোলের মতো। মাঝখানে ফোলা আর দু'পাশে অপেক্ষাকৃত সরু। যেমনি আকস্মিক ভাবে নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে এসে পড়েছিল; তেমনি হঠাৎ এক সময় দূরে সরে গেল। কিন্তু অগ্নিময় টানাসূত্রের পক্ষে আর সূর্যদেহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হলো না। সূর্যের আবর্তনের বেগ গ্রহণ ক'রে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন অগ্নিময় অংশ তেজ হারিয়ে ঘন হতে আরম্ভ করে। তখন বাষ্পপিণ্ড ভেঙে বিভক্ত হলো ক্ষুদ্রতর অংশে। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে তাদের মধ্যে যে বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তার সঙ্গে সূর্যের প্রবল আকর্ষণী শক্তির সামঞ্জস্য হয়ে যে বেগ থাকলো, তার ফলশ্রুতিতে অংশগুলি ঘুরতে শুরু করলো সূর্যের চারপাশে। ছোট বড়ো টুক্রোগুলো এক একটি গ্রহ। আমাদের পৃথিবীও তাদেরই এক শরিক। টুক্রোগুলি ক্রমশই তেজ ছড়িয়ে দিতে লাগলো, ঠাণ্ডা হলো। প্রথমে এল জল, কারণ বায়বীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে প্রথমে জলে পরিণত হয়, পরে আরো শীতল হলে কঠিন হয়। যদিও সমস্ত বায়বীয় পদার্থ কঠিন বা তরল হয়, কিছু বায়ব আকারেই থাকে। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হলো, তখন বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমে তরল হয়ে সমস্ত ঢালু জায়গা ভর্তি করে দিল।

ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর নিজস্ব মত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ইতিপূর্বে তাঁর বক্তব্যের যে অংশ উদ্ধৃত করেছি 'মনে করুন ......এই মতটিরই অধিক পক্ষপাতী'—তা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌দের কথার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে স্বামীজীর একটি বিশেষ মন্তব্য উল্লেখ করবো। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও ক্রমবিবর্তনের পালা চলছে। তিনি বলেছেন —এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে এল, নিঃসন্দেহে তা আগেকার কোন

সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড থেকে। আর দেখা যায় শূন্য থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না। স্বামীজীর ভাষায়[৩১]—

> 'We see then, that nothing can be created out of nothing. Everything exists thro' eternity. Only the movement is in succeeding waves and hollows going back to fine forms and coming out into gross manifestation. This involution and evolution is going throughout the whole of nature. The whole series of evolution beginning with the lowest manifestation of life and reaching up to the highest, the most perfect man, must have been the involution of something else'.

(তাহলে আমরা দেখছি যে শূন্য থেকে কোন কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সব জিনিসই অনন্তকাল ধরে আছে এবং থাকবেও। কেবল ঢেউয়ের মত একবার উঠছে, আবার পড়ছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমগ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে। নিম্নতম প্রাণী থেকে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকলেই কোনকিছুর ক্রম-সঙ্কুচিত অবস্থা।) অনূদিত

প্রথমে স্বামীজীর বক্তব্যের প্রথমাংশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ ব্যাপারে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বসম্পর্কে যে সব কথা বলে গেছেন তার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুয়িন হাব্‌ল আবিষ্কার করেন যে, বিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র এবং অগণিত নীহারিকা একে অপরের কাছ

৩১. Complete Works of Swami Vivekananda. (1958). vol II, 'The cosmos' (The Macrocosm).

থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দূরে চলে যাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বিশ্ব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্ব যে প্রসরণশীল তা অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন।

বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মনে করা যাক, ঐ বেলুনের গায়ে অনেক কিছু চিহ্ন দেওয়া আছে। বেলুন যখন চুপসে থাকে, তখন বিন্দুগুলি গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু বেলুন যতই ফুলবে, বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্বও তত বাড়বে। বিশ্ব-বেলুনের গায়ে বিন্দু চিহ্নগুলি নক্ষত্র-নীহারিকার দল। তফাৎ এই যে, বেলুনের মধ্যে ফাঁপা আছে। বিশ্ব-বেলুনের মধ্যে কোন ফাঁপা নেই। এই পরিকল্পনা মেনে নিলে বিশ্বকে সীমায়িত বলা চলে না যেহেতু বিশ্বের বিস্তার স্তব্ধ হবার সঙ্গত কারণ নেই। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে -সে প্রশ্নটি হচ্ছে - আদি কোথায়? নক্ষত্র-নীহারিকার দল একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে— তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে জিজ্ঞাস্য—যখন থেকে অপসারণ ক্রিয়া শুরু হলো, তার আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল?

শেষ প্রশ্নটির জবাব দিলেন 'বিগ্ ব্যাং থিয়োরীর' সমর্থকেরা। এঁদের মধ্যে আছেন বার্ণাড লভেল, মার্টিন রাইল, জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করেন—যখন থেকে বিশ্ব বিস্তৃত হতে আরম্ভ করলো, তার কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বের সমগ্র বস্তুনিচয় ঘননিবদ্ধ ছিল -অনেকটা ডিমের মত। তাকে বলা হলো 'কস্‌মিক এগ্'। তাঁদের মতে বহু বছর আগে আকস্মিক ভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে তা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। এ থেকেই এসেছে গ্যালাক্সি এবং সূর্যসমূহ। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণাগুলি আবার দানা বাঁধতে লাগলো। তা থেকেই প্রথমে নীহারিকা ও পরে তারার জন্ম। বিস্ফোরণের ফলে বস্তু কণাগুলির মধ্যে এত অধিক মাত্রায় বেগ

সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। অপসারণ ক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের অবস্থা কেমন ছিল? তবে তাঁরা একথা বলেন যে, কোটি কোটি বছর আগে যেমন চেহারা ছিল আজ আর তা নেই।

পালসেটিং থিয়োরী বা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্ব আলোচনা করলে স্বামীজীর বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যেতে পারে। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রসরণশীলতা কমে আসছে এবং এক সময়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে শুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। অবশেষে বিশ্ব এক ঘননিবদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে, তখন হবে আবার এক বিস্ফোরণ। পরেই প্রসারণ ক্রিয়া আরম্ভ হবে, এবং শেষে পুনরায় সঙ্কোচন। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলেন যে, বিস্ফোরণের ফলেই জন্ম নিয়েছে তারকাপুঞ্জ। তারপরে তারা মহাকাশে ধাবিত হতে থাকে। জন্মক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে যায়; তবে তার একটা সীমা আছে। তার পরেই আবার সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বেকার ঘনত্বে ফিরে আসে।

কতিপয় জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে যখন বিশ্ব বস্তুপিণ্ডরূপে অথবা অতি ঘননিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন তা ছিল, শুধু শক্তিপুঞ্জ। তারপর বিশ্ব যত প্রসারিত হতে লাগলো, তখন শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে আরম্ভ করলো। পূর্বেকার তত্ত্ব অনুসারে একথা ধারণা করা যেতে পারে, শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্তুতে পরিণত হবে, তখন তার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে।

পালসেটিং থিয়োরী অনুসারে জানা যায় যে, সর্বোত্তম বিস্তৃতির সময়েও অনেক শক্তি বাড়তি থাকে। তার ফলে গ্যালাক্সিপুঞ্জ (Cluster of Galaxies) তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের

সাহায্যে (গ্র্যাভিটি) ফের চলতে শুরু করতে পারে এবং বিপরীত ক্রিয়া বা সঙ্কোচনের পালা আরম্ভ হয়।

স্থির-তত্ত্ব বা স্টেডি-স্টেট থিয়োরীর মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্ত কাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অন্তিম দশা প্রাপ্ত হলে তার জায়গায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে—এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। আদিতে যে সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, এখনও তাই আছে। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য স্মরণীয়। স্টেডি-স্টেট থিয়োরীর সঙ্গেও স্বামীজীর ধারণার মিল সুস্পষ্ট।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেন যে, বিশ্ব বিস্তারশীল তা ঠিক। কিন্তু বিস্তারের ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে তা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধাক্কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভর্তি করে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে।

বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Abbe Lemaitre বলেন যে, মহাকাশ কখনো গ্যালাক্সিবর্জিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে না। কারণ তারা ক্রমে হটে যাচ্ছে। তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে নতুন ব্রহ্মাণ্ড। যে হারে বস্তু সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই হারে নতুন বস্তু তৈরি হচ্ছে। তবে এই হার খুব কম। বাস করবার ঘরের পরিমিত স্থানে একটি সম্পূর্ণ নতুন হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি হতে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর লাগে। তবে যেহেতু এই পদ্ধতি অনাদি কাল ধরে চলে আসছে যেহেতু প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন (প্রায় পঞ্চাশটি সূর্যের ওজনের সমান) প্রতি সেকেণ্ডে উদ্ভূত হচ্ছে। এই সৃষ্টির কাজ অতি রহস্যময়। কোন্

শক্তি থেকে এই বস্তুনিচয় সৃষ্টি হচ্ছে তা সামান্য বলা হয়েছে, কিন্তু এই শক্তি আসছে কোথা থেকে সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এই যে অনবরত বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তা আসবে কোথা থেকে? ফ্রেড হয়েল বলেন, 'It does not come from anywhere. Material simply appears, it is created'. স্বামীজীর বক্তব্য পুনরায় পাঠ করলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য অনুভব করা যাবে।

ক্রমবিকাশবাদ হ'ল বিবেকানন্দের বেদান্ততত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। তার দর্শনে তিনি পাঁচটি প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন। তার মধ্যে ক্রমবিকাশবাদ ও ক্রম-সঙ্কোচবাদ, বৃত্তাকারে বিবর্তন, সর্বব্যাপী অপরিবর্তনীয় আত্মবস্তুর অস্তিত্ব এবং অনন্ত শক্তিবত্তা ও মানুষের চৈতন্য স্বরূপতা অন্যতম। ক্রমবিকাশবাদ ও (ক্রমসঙ্কোচবাদ) কথা আগেই বলা হয়েছে। বৃত্তাকারে বিবর্তনের কথাও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানী সার্ডিন বলেন।[৩২]

> 'Thus wherever we look on earth, the growth of the 'within' only takes place thanks to a 'doubly related involution', the coiling up of the molecule upon itself and coiling up of the planet upon itself. The initial quantum of consciousness contained in our terrestrial world is not formed merely of an aggregate of particles caught fortuitously in the same net.'

স্বামীজীর দর্শনের সব ক'টি প্রকল্প বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান

৩২. The Phenomenon of Man, (p 73—74).

অনেক কিছুর ব্যাখ্যা আজও দিতে পারেনি। C. E. M. Joad তাঁর 'Philosophical Aspects of Modern Science'এ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা বলেছেন। সর্বব্যাপী অপরিবর্তনীয় আত্মবস্তুর অস্তিত্বের কথা আধুনিক কালের কতিপয় বিজ্ঞানীর মধ্যে শোনা যাচ্ছে। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনের ভাষায়,

> 'There is no doubt that the scheme of physics as it has stood for the last three quarters of a century postulates a date at which either the entities of the universe, were created in a state of high organisation or pre-existing were endowed with that organisation which they have been squandering ever since.
>
> More over, this organisation is admittedly the antithesis of chance. It is something which could not occur fortuitously....... It has been quoted as scientific proof of the intervention of the Creator at a time not infinitely remote from to-day.
>
> But I am not advocating that we draw any hasty conclusions from it. Scientists and theologicians alike must regard as some what crude and naive theological doctrine which (suitable disguised) is at present to be found in every text book of thermodynamics, namely that some billions of years ago God worked up the material universe and has left it to chance ever since. It is one of those conclusions from which we can

see no logical escape—only it suffers from the drawback that it is incredible.

ক্রমবিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? স্বামীজী বলেন, এর মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করবে। বিবর্তনের সমস্ত প্রক্রিয়াই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করবার জন্য সংগ্রাম। এ প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ ক'রে নয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই মানুষ বর্তমান অবস্থা লাভ করেছে। তাঁর কথায়:

'প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা রক্ষা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি, এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, এই বৃক্ষ ইহারা সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা রাখিয়া চলিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু। মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি। প্রকৃতির অনুগত হইয়া নয়।'[৩৩]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখে এসেছি যে, স্বামীজীর মতবাদ বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। 'জগৎ' ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ তুললে দেখা যায় সমস্ত বিজ্ঞানই বেদান্ত-গ্রাহ্য। জার্মান দার্শনিক Gustav Menshing বলেছেন যে, বিবেকানন্দের ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব

৩৩. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সং, ২য় খণ্ড ('প্রকৃতি ও মানুষ')।

বিজ্ঞানসম্মত।[৩৪] বিবেকানন্দ নিজেও বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির ব্যাপারে সাংখ্যমতের সঙ্গে আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের পার্থক্য অতি অল্প।

স্বামীজী বলেছেন, বিশ্বের ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ এই দুই পথ বৃত্তাকার। এই জগতে কোন গতি সরল রেখায় সম্ভব নয়। গণিতবিদ্‌রা বলেন যে, কোন সরলরেখাকে যদি ক্রমাগতভাবে বাড়ান যেতে থাকে তাহলে তা একটি বৃত্তে পরিণত হবে। স্বামীজীর কথায়—'আমরা ক্রমাগত সরল রেখায় চলিতেছি এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র।' ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদে সরল রেখায় উন্নতিতত্ত্ব বলা হয়েছিল। অর্থাৎ কেবলমাত্র ক্রমবিকাশ। বিবেকানন্দ এই তত্ত্বের ত্রুটি দেখিয়ে বলেছেন, ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কোচন হবেই। এ অবধারিত সত্য। আইনষ্টাইনের চতুর্মাত্রিক সত্তার আবিষ্কারের পর জানা গেল যে, কোন সত্তার মধ্যে যখন জড় পদার্থের অস্তিত্ব থাকবে না, তখনই তার সাম্যাবস্থা এবং তখন তার বিস্তৃতিও অনন্ত। কিন্তু যে মুহূর্তে জড়ের আবির্ভাব ঘটবে তখনই সেই বিস্তৃতি হ্রাস পায়।

> 'যেখানে জড়পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকেচুরে যায়। এবং এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন এক পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচোরার মধ্যে এসে পড়ে, তখন আর ঋজুভাবে চলতে পারে না, বাঁকা-চোরার রীতি অনুয়ায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব বিজ্ঞানের

৩৪. Gustav Menshing—'The importance of Vivekananda in Religion and science of Religion'—Swami Vivekananda centinary Memorial Number: Bulletin of R. K. Mission Instn. of Culture.

অনুপন্থী। তাঁর এই ক্রমবিকাশ-ক্রমসঙ্কোচন তত্ত্ব শুধু দৈহিক বিষয়েই কার্যকরী নয়, তা মানসিক বিবর্তন ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্মতত্ত্বে ক্রমবিকাশকে বলা হয়েছে ত্যাগ। ক্রমবিকাশের ফলেই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

এই প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও একটু আলোচনা করলে ভাল হয়। সাংখ্য-পাতঞ্জল, উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এ সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। জৈমিনির মতে (পূর্ব মীমাংসা) জগতের উৎপত্তি নেই, অতএব বিনাশও নেই! বর্তমানে যে অবস্থায় ও যে নিয়ম অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, অতীতেও একই নিয়মে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও একই নিয়মে চলবে। এখানে ফ্রেড হয়েলের বক্তব্য স্মর্তব্য। জৈমিনি বলেন, 'ন কদাচিদনীদৃশম্' —কদাচ অন্যরকম নয়। অনাদি অতীত কাল থেকে সুরু ক'রে অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধরেই একই নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলতে থাকবে।

সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে মহাজাগতিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। সাংখ্যকার 'পঞ্চবিংশতি' তত্ত্ব অবলম্বনে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমিক ধারা নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন :

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্
মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রান্যুভয়মিন্দ্রিয়ং
তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

— সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি ; প্রকৃতি থেকে মহান, মহান থেকে পঞ্চতন্মাত্রা ও দুই ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চস্থূলভূত। পুরুষ সহযোগে মোট পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

প্রকৃতি কি? সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি হল জগতের মূলবস্তু। জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা আর প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা

হল জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্না—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এদের বলা হয় প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব বা অবয়ব।

পুরুষ বা আত্মার (universal self) সন্নিধিবশতঃ তার তুরীয় (transcendental) প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। তখনই মহাজাগতিক অভিব্যক্তি বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে তিন গুণের নির্বিশেষ সংমিশ্রণ ভেঙে হয় সবিশেষ (heterogeneous)। সমষ্টিগতভাবে পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম হয় না। গুণের পারস্পরিক রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তার বিনাশ ঘটে না। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এ বিষয়ে সুন্দর কয়েকটি লাইন রচনা করেছেন।[৩৫] তা তুলে ধরছি :

> 'এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের, সাম্যের মধ্যে বৈষম্যের, নির্বিশেষের (undiffrentiated) মধ্যে বিশেষের (diffarentiated), অযুতসিদ্ধের (incoherent) মধ্যে যুতসিদ্ধের (Coherent) আবির্ভাব।
>
> প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, বিকার বা বিকাশ ঘটে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ; এর ফলে উদ্ভব হয় মহত্তের। একে চেতনা (Consciousness) বা বোধশক্তির বীজ বা মহাজাগতিক সূক্ষ্ম সমষ্টিগত চেতনা (universl conscions stuff) বলা যেতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে জগতের প্রথম প্রস্ফুরণ। বিশ্বগত আমি বোধ (universal self consciousness) হচ্ছে মহত্ত্বের পরিচায়ক।'

প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার হল অহংবৃত্তি। অহংতত্ত্ব আবার

৩৫. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৪৫।

দু'রকমের। রাজসিক অহঙ্কার বা অস্মিতা (empirical ego) এবং তামসিক অহঙ্কার বা তন্মাত্রা (সূক্ষ্মভূত)।
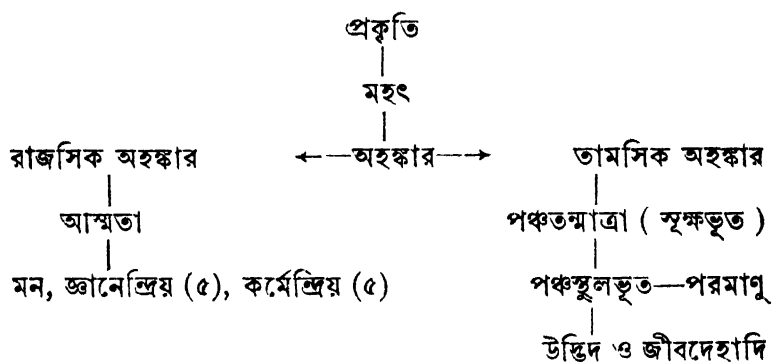
বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তত্ত্বের তুলনা করলে সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ বেশ অনুভব করা যায়। নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির কল্পনা করা সত্যই অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে 'চেতনার' কোন স্থান নেই। আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদি উপাদান। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাশূন্যে অবিরত সৃষ্টি হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস। 'শক্তিকণা বা ফোটন হল হাইড্রোজেন পরমাণুর মালমসলা'। কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্ব এসব তত্ত্বকেও অতিক্রম ক'রে গেছে।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাবের কালের নির্ণয়ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্মশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাশ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ॥

মোটকথা ৮২ লক্ষ (২০+৯+৯+১০+৩০+৪) যোনি ভ্রমণের পর জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

সাংখ্যকার কপিল বলেন, এই জগৎ সৃষ্ট হয়নি, তার স্রষ্টা কেউ নেই। জগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। তিনি বলছেন প্রকৃতিই এই জগতের কারণ। প্রকৃতির পরিণাম বা রূপান্তর হল বিশ্ব।'

'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্' (সাংখ্যদর্শন, ১।৬৭)

প্রকৃতিই সকলের মূল, তার মূলে কেউ নেই। কোন এক পরম পুরুষ জগতের সৃষ্টিকর্তা—এমনি যে প্রবাদ আছে তার সম্বন্ধে কপিল বলেছেন ঃ

'প্রকৃতেরাদ্যোপদানতানেষ্যাং কার্যত্বশ্রুতে' (সাংখ্যদর্শন, ৬।৩২) অর্থাৎ 'প্রকৃতিই হচ্ছে আসল সৃষ্টিকর্তা, পুরুষেতে তার আরোপ হয় মাত্র'। জগতের ক্রমবিকাশ হয় প্রকৃতি থেকেই। **'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ'** (সাংখ্য ১।৭৮)—অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের অথবা নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ 'শ্রুতি'তে বলা হয়েছে জগতের সৃষ্টিকারী ঈশ্বর। তাহলে কি তা ভুল? এর উত্তরে কপিল বলেছেন, **'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধসব্যা'** (সাং ১।৯৫) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষের প্রশংসাপত্র মাত্র। সেখানেও যে ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা এমন কোন উল্লেখ নেই।

কপিল বলেন, মূল প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন অবস্থার ক্রমবিকাশ হল সৃষ্টি, আবার মূল প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া হল প্রলয় বা ধ্বংস। এই চক্র ঘূর্ণায়মান।

কপিলের প্রধান ত্রুটি হল তিনি ক্রমবিকাশকে "পরিমাণ গত পরিবর্তন, সমস্ত গতিকে যান্ত্রিক গতি বলে মনে ক'রে বস্তু ও চৈতন্য, জড় ও মনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। গুণগত

পরিবর্তনের জন্য, নূতনের জন্য, নূতনের আবির্ভাবের জন্য এক বাহ্যশক্তির কল্পনা করতে হয়েছে"।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'ঐতরেয়' এবং 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ থেকে জীবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল এখানে সেগুলির পূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধরছি ঃ

'অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বাগাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্'

(ঐতরেয়, ৩।১।৩)

এই বক্তব্যে আছে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীবের কথা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৩।১) আছে—

'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি'

অর্থাৎ বিভাগ তিন প্রকারের— অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।

'স্বেদজ প্রভৃতি জীবেরা এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। অণ্ড প্রভৃতিকে কারণ না বলিয়া অণ্ডজ প্রভৃতিকে কারণ বলা হইয়াছে।'

(উপনিষদ গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ, পৃ ৩১১,
—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

'সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্ম শক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপ পশূন্ খগদংশমৎস্যান্

তৈস্তৈরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥

—ভগবান পরমেশ্বর নিজশক্তি প্রকৃতির সাহায্যে বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, দংশ ও মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ জীব-শরীর সৃষ্টি ক'রে সেই সেই

শরীরের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যশরীর সৃষ্টি করে সন্তোষলাভ করেছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় হ'ল, প্রকৃতি যে সৃষ্টি করেন তা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন শর্বশক্তিমান পরমেশ্বর।

মুণ্ডকোপনিষদেও জগৎ সৃষ্টির ভাষ্য পাওয়া যায়--

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সার্বন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥ (মুণ্ডকো, ২।১।৩)

--এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, লগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।

সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যো হন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরস ময়ঃ। (২।১।৩)

—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে অবস্থিত ব'লে যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মারূপে যুগপৎ সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু উপভোগ করেন।' উক্ত এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হল, আকাশ থেকে বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ; ওষধি হতে অন্ন, এবং অন্ন থেকে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ) উৎপন্ন হল। উক্ত এই পুরুষ অন্নরসের পরিণাম—এই ব'লে প্রসিদ্ধ।

বিজ্ঞানের বহু শাখার মধ্যে স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর মতে মনোবিজ্ঞান হ'ল সেরা বিজ্ঞান। যদিও এইশাখা উপযুক্ত সম্মান লাভে বঞ্চিত। জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে স্বামীজীর তুলনামূলক বক্তব্য আলোচনার সময়ে তা জানা যাবে। তার আগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে স্বামীজীর মতামত অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

ধর্মসংঘের অন্যতম নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তিনি ধর্মের জটিল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ ক'রে সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য ক'রে দিয়ে গেছেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ সুস্পষ্ট একথা তিনিই প্রথম শোনালেন। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে। এই বিশ্লেষণ অনুধাবন করলে বিস্মিত হ'তে হয় বিজ্ঞানের উপর তাঁর গভীর অনুরাগ এবং বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা প্রত্যক্ষ ক'রে।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ জানতেন, সর্বদেশে ভারতীয় ধর্মকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাতে হলে প্রয়োজন নতুন পদ্ধতির। অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মীয় তত্ত্বকে অলীক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয় ব'লে উপেক্ষা করে তা তিনি অবহিত ছিলেন। কিন্তু যদি এর সঙ্গে বিজ্ঞানের সমধর্মীতা বা বিজ্ঞানের সাহায্যে এর প্রামাণিকতা প্রমাণ করা যায়, তাহলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হতে বাধা হবে না।

ধর্মগ্রন্থে 'আত্মা' কথাটির ব্যবহার প্রচুর। এই কথাটির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা অনেকেই দিতে পারেননি, কারণ স্থূল বিজ্ঞান মতে দেহের মধ্যে 'আত্মা' নামক বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এই দুর্বোধ্য বস্তুটিকে বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ-যে অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। প্রথমতঃ বিষয়ানুভূতি বোঝালেন। অনুভূতি কি তা বোঝালেন শারীরবিদ্যার তত্ত্ব সাহায্যে। তাতেও পরিষ্কার হ'ল না দেখে তিনি বৈজ্ঞানিক উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বললেন—

'মনে কর একটি ক্যামেরা রহিয়াছে, আর একটি বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার

চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোককিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐস্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যক যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থিরবস্তুর প্রয়োজন। কারণ, আমি যে আলোককিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা কবিতেছি সেগুলি সচল: এই সচল আলোককিরণ-গুলিকে কোন অচল বস্তুব একত্রীভূত, একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে যে সকল অনুভূতি লইয়া মনেব নিকট এবং মন বুদ্ধিব নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদেব সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন বস্তু পাওয়া যায়, যাহাব উপব এই চিত্র ফেলিতে পারা যায় যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটি একত্বেব ভাব প্রদান করে? এই কিছু যাহার উপর মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে—এই কিছু যাহার উপব মন ও বুদ্ধি দ্বাবা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতি সকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীভূত হয়, তাহাকেই মানুযেব আত্মা বলে।'

ব্রহ্ম থেকে বের হয়ে আত্মা নানা উদ্ভিদ ও পশুর মধ্য দিয়ে অবশেষে মানব শরীরে উপস্থিত হয়; মানুষই ব্রহ্মের নিকটতম। যে ব্রহ্ম থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি তাঁর কাছে ফিরে যাওয়াই হ'ল মহান জীবন সংগ্রাম। স্বামীজী বলতে চাইছেন আত্মা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে যাত্রা সুরু করে পুনরায় ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই তার লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গটি তিনি বুঝিয়েছেন তড়িৎ বিজ্ঞানের উপমা দিয়ে—

'যেরূপ ডায়নামো হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত (Circuit) সম্পূর্ণ করিয়া ডায়নামোতেই প্রত্যাবর্তন করে, আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে।'

এই যে আত্মার কথা বলা হ'ল তার স্থান কোথায়? শারীর বিজ্ঞানীরা বলবেন দেহের কোথাও এই বস্তুটির অস্তিত্ব নেই। তাহলে আত্মা কি নেই? স্বামীজী সর্বপ্রথম একথার বৈজ্ঞানিক উত্তর দিয়েছেন। ১৯০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পত্রে তিনি বলেছেন, "হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন্' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা।" স্বামীজীর বক্তব্যটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই প্রসঙ্গে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন্ সম্পর্কে কিছু অবহিত হতে হবে।

"Sympathetic Ganglia : Three classes of sympathetic ganglia. (1) Vertebral ganglia—consists of about twentytwo ganglia, lying by the side of the vertebral bodies and connected together by nerve fibres in the form of a chain. It extends from the base of the skull to the front of the Coccyx. As a rule there is one ganglion for each segment. But they show tendency to coalesce. In the thoracic region, there are from ten to twelve ganglia on each side. The first thoracic ganglion in man sometimes fuses with the Inferior Cervical ganglion forming Stellate Ganglion. In the lumber region there are usually four. In the Sacral, four to five, while in the Coccygeal region the terminal portions of the two sympathetic chains fuse toghther and form a single ganglion in front of the coccyx.'[১]

---

১. Dr. C.C. Chatterji : **Human Physiology, 2nd Edn.**

জ্ঞানের প্রকাশ সম্বন্ধেও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চোখের সামনে একটা কুঁজো থাকলে কি ক'রে আমরা দেখি? ঐ কুঁজো থেকে আলোক কিরণ আমাদের চোখে প্রবেশ করে। এই কিরণরাশি অক্ষিজাল বা রেটিনার উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করে। আর ঐ ছবি মস্তিষ্কে উপনীত হয় স্নায়ুপথ বেয়ে। তখনো দর্শন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, ভিতব থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নি। প্রতিক্রিয়া হলেই কুঁজো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। বিবেকানন্দ বলেছেন—

> 'এই প্রতিক্রিয়া হইলেই উহাদের জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ হইব।'

এই প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রটিকে তিনি 'মন' বলেছেন। তাঁর মতে এই প্র তক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রাজযোগের মধ্যে কোন সংযোগ আছে বলে আমাদের জানা ছিল কি? না। একটি স্থূল জগতের, অপরটি অধ্যাত্মজগতের। এদের মধ্যে ন্যূনতম সাদৃশ্য বর্তমান তা কল্পনাতীত। এই বিষয়টি তিনি প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

> 'পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে? উহা বহিরুপায়ে প্রাণায়াম। প্রাণ যখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক উপায়েই উহাকে সংযম করা যাইতে পারে। যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্থূলরূপগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবাব চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান বলে। আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশ-গুলিকে আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা সংযমের চেষ্টা করা হয়, ইহাকেই রাজযোগ বলে।'

রাজযোগকে তিনি বিজ্ঞান বলেছেন। 'প্রাণ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন পুরোপুরিভাবে। তিনি বলেছেন, 'প্রাণ' থেকেই সব শক্তির বিকাশ। এই প্রাণ গতিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রাণই স্নায়ুশক্তিপ্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তাশক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সমস্ত কিছুই প্রাণের বিকাশ মাত্র।

এই প্রাণই সমস্ত প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে বিরাজিত। চিন্তা-ই প্রাণের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া। চিন্তাব যতটা আমরা দেখে থাকি সেটুকুই তার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-শূন্য চিন্তাও আছে, তা আমাদের নিম্নতম কার্যক্ষেত্র। একটা মশা কামড়ালে হাত স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাকে আঘাত করবে। তাকে মারবার জন্য হাত ওঠাতে নামাতে কোন বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ চিন্তারই এক ধরনের অভিব্যক্তি। শরীরের জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়া মাত্রেই (শারীরবিদ্যায় একে reflex action বলে) চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত। চিন্তার আর একটা স্তর আছে। তাকে সজ্ঞান বলা যেতে পারে। মন যখন সমাধি-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন তা যুক্তির সীমাব বাইরে চলে যায়। শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ প্রাণেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ঠিক পথে পরিচালিত হলে তা মনকে প্রেরণা দেয়।

জগতের সমস্ত বস্তুই 'ঈথার' থেকে উৎপন্ন। কাজেই তাকে সমস্ত জড়বস্তুর প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ঈথারকেই মনের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

'তথাপি ইথার এক অখণ্ড জড়বস্তু রূপেই থাকিবে। যদি সেই সূক্ষ্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পার, তবে অনুভব করিবে—সমগ্র জগৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দনে সংগঠিত। কখনও কখনও কোন ঔষধেব শক্তিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকিয়াও ঐরূপ অবস্থায় নীত হই। তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যাব হাম্ফ্রি ডেভির বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন ; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাববাশিব সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য স্থূল-কম্পনগুলি যেন থামিয়া গিয়াছিল, কেবল সূক্ষ্ম-কম্পনগুলি—যেগুলিকে তিনি ভাববাশি বলিয়া অভিহিত করেন, শুধু সেগুলিই তাহাব অনুভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সূক্ষ্ম কম্পনগুলি দেখিতে পাইতেন। সব কিছু চিন্তারূপে পবিণত হইয়াছিল।'[২]

স্বামীজী বলেন ফুস্ফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তাব ক্রিয়াতেই প্রাণেব ক্রিয়া সহজে বোঝা যায়। ফুস্ফুসেব গতি বন্ধ হলে দেহের সব ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অনেক লোক আছেন যাঁরা নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেছেন যে, তাঁদের ফুস্ফুসের গতি বন্ধ হয়ে গেলেও শরীব জীবিত থাকে। বিবেকানন্দ বলেন ঃ

'প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ - ফুস্ফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা। এই গতিব সহিত শ্বাসযন্ত্রও জড়িত। শ্বাস-প্রশ্বাস যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই গতিই শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে। এই বেগই পাম্পের মত বায়ুকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই

২. প্রাণ ঃ স্বামীজীর বাণী ও বচনা, ১ম খণ্ড।

ফুস্‌ফুস্‌কে চালিত করিতেছে। এই ফুস্‌ফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুস্‌ফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম।'[৩]

প্রাণায়ামের এমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আগে পাওয়া যায়নি। প্রাণায়াম তো হ'ল। তাহলে 'প্রাণ' কি? এর উত্তরে স্বামীজী যা বলেছেন তা একেবারে বিজ্ঞানের কথা।

'যে শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাংসপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুস্‌ফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ।'

এমনিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতের প্রতিটি কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আগে যাঁরা এসব বুঝিয়েছেন, বলা বাহুল্য তাঁরা কেউ-ই বিজ্ঞানের ধারে-কাছেও যাননি। এজন্যই তা যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানবাদী মানুষের কাছে সাদর-গ্রাহ্য হয়নি।

'প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নরদেহতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিধান শাস্ত্রের বিবিধ অংশকে প্রয়োগ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, এ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মেজাজের ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

যোগশাস্ত্রে 'ইড়া ও পিঙ্গলা' নামে দু'টি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও 'সুষুম্না' নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নীচু প্রদেশে 'কুণ্ডলিনী' পদ্ম অবস্থিত বলে যোগীরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, এটি ত্রিকোণাকার। তাঁরা মনে করেন এখানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হয়ে আছেন। এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হলে শূন্যনালীর পথ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। যতই তিনি উঠে যান ততই যোগীর নানা ধরনের অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি

---

৩. প্রাণ: স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড।

লাভ হতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে হাজির হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন থেকে পৃথক হয়ে যান। এ সবই যোগশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এই বিষয়টিকে বিবেকানন্দ যেভাবে বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন তা অপূর্ব মুন্সীয়ানার পরিচায়ক।

স্বামীজীর বক্তব্য প্রকাশের আগে সুষুম্না সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। শারীর বিজ্ঞানে সুষুম্না শীর্ষক (Medulla Oblongata) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) এর কথা আছে। সুষুম্নাকাণ্ডটি নলাকৃতির। মেরুমধ্যস্থ নলাকার প্রণালীতে এটি দড়ির মত বস্তি-প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গিয়ে অতি সরু লাঙ্গুলাগ্রে (filum terminale) শেষ হয়েছে। এটি প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা। চওড়াতে আঙুলের মত। মাথার নীচে শরীর সমস্ত অংশ থেকে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ ইত্যাদি সংবেদীয় অনুভূতি, 'পেশী রজ্জুরা' অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী হতে অঙ্গবিন্যাস-সংশ্লিষ্ট অসংজ্ঞ পেশীর অনুভূতির কেন্দ্রাংশে বহন, চেষ্টীয় কেন্দ্রকোষের সাহায্যে পেশীর সঙ্কোচন এবং চেষ্টীয় তন্তুর ঊর্ধ্বভাগের সাহায্যে এদের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ড সমাধা করে। তাছাড়া 'সহযোগী শ্বসনকেন্দ্র ও নিম্নধমনী সংকোচক কেন্দ্র থাকাতে সময় সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচলের নিয়ন্ত্রণও এর দ্বারা হতে পারে। সমব্যথী স্নায়ুর উৎপত্তিস্থল ব'লে তারারন্ধ্রের বিস্ফারণ, লালাক্ষরণ, হৃদ্স্পন্দনের গতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্তপ্রণালীর সংকোচন, অ্যাড্রিনেলিনের ক্ষরণ প্রভৃতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত মল ও মূত্র ত্যাগ, সন্তান প্রসব এবং হাটুর ঝাঁকানি প্রভৃতির কেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত।'[৪] এবারে স্বামীজীর বক্তব্য অনুসরণ করা যাক।

---

৪. ডঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শারীর বৃত্ত।

'আমরা জানি, সুষুম্নাকাণ্ড এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ৪—এই অক্ষরটিকে যদি লম্বালম্বিভাবে (৪) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দু'টি অংশ রহিয়াছে এবং ঐ দু'টিই মধ্যদেশে সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে যেরূপ দেখায়, সুষুম্না কতকটা সেইরূপ। উহার বামভাগ 'ইড়া', দক্ষিণভাগ 'পিঙ্গলা' এবং যে শূন্য নালী সুষুম্নার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে, তাহাই 'সুষুম্না'। কটিদেশের নিকট মেরুদণ্ডের কতকগুলি অস্থির পরেই সুষুম্না শেষ হইয়াছে ; কিন্তু তাহা হইলেও একটি অতিসূক্ষ্ম তন্তু বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী ঐ তন্তুর মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral Plexus) অবস্থিত। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) মতে উহা ত্রিকোণাকৃতি। বিভিন্ন স্নায়ুজালের কেন্দ্র সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত ; ঐ-গুলিকেই যোগীগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।'[৫]

যোগীরা মনে করেন, সবচেয়ে নীচে মূলাধার থেকে সুরু ক'রে মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতগুলি কেন্দ্র আছে। স্বামীজী বলেন, যদি এই পদ্মগুলিকে ঐ স্নায়ুজাল (Plexus) বলে মনে করা যায় তাহলে আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় সহজেই যোগীদের কথার ভাব বোঝা যায়। এই ভাবটিকে বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী শারীরবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'আমরা জানি, আমাদের স্নায়ুর মধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে। তাহাদের একটিকে অন্তর্মুখ অপরটিকে বহির্মুখ,

---

৫. প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ।

একটিকে সংবেদাত্মক (Sensory) অপরটিকে চেষ্টাত্মক (motor), একটিকে কেন্দ্রাভিগ ও অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যায়। ঐ স্পন্দন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। পরবর্তী ব্যাখ্যা সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক-মজ্জায় একটি কন্দে (bulb) শেষ হইয়াছে ; কিন্তু উহা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কেব অন্তর্গত তরল পদার্থে ভাসমান। মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে ঐ আঘাতের শক্তি ঐ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র এই তিনটির কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।'

এর পরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রাণায়াম বোঝানব জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই তিনি এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তড়িতের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন যে, তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের পরমাণুকে একদিকে গতিশীল করে। উপমা দিয়ে তিনি বললেন যে, এই ঘরে যে বাতাস রয়েছে তার সব পরমাণুকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায় তাহলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুতাধাব যন্ত্রে বা ব্যাটারিতে পরিণত হবে। এরপবে তিনি শারীর বিজ্ঞানের আর একটি তত্ত্বের কথা বললেন। তত্ত্বটি হ'ল এই : যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রগুলি নিয়মিত করে, স্নায়ুপ্রবাহগুলির উপরও তার খানিকটে প্রভাব

আছে। ঐ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত। এর কাজ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করা এবং আরো যে সব স্নায়ুচক্র আছে, তাদের উপরেও কিছু প্রভাব বিস্তার করা। এবারে তিনি প্রাণায়ামের ক্রিয়া প্রসঙ্গে এলেন।

নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে শরীরের সমস্ত পরমাণু একদিকে গতিসম্পন্ন হওয়ার প্রবণতা লাভ করে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমস্ত স্নায়ুপ্রবাহ এক ধরনের তড়িৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যেহেতু স্নায়ুগুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্নায়ুর দু'দিকে বিপরীত শক্তি উদ্ভূত হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন তা তড়িতের মত কোন শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যখন শরীরের সমস্ত গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, তখন শরীর যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুতাধারস্বরূপ হয়ে পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম-ক্রিয়া সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন :

> 'উহা শরীরের মধ্যে ছন্দের মত এক প্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য--মূলাধারে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা।'

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হয়ে মস্তিষ্কে উপনীত হলে কেন যোগীরা বাহ্যজ্ঞান শূন্য, দেহ-জ্ঞান-রহিত হন তার এক সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। 'ধ্যান ও সমাধি' প্রবন্ধে তিনি উভয়ের বিশ্লেষণ করেছেন পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের সহায়তায়।

প্রাণায়াম সাধনে প্রাণকে বশে আনা যাবে। যখন প্রাণ

নিয়ন্ত্রিত হবে তখন দেখা যাবে যে প্রাণের অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়া আমাদের আয়ত্তে এসেছে। এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লোপ পেয়েছে আর পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হয়ে পড়েছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে, পশুরা তা করতে পারে। এই শক্তি চালনা করি না বলেই আমাদের এ শক্তি নেই। 'ইহাকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (atavism) বলা হয়।'

এই atavism হ'ল উর্ধ্বতন পূবপুরুষের (পিতার নয়) গুণদোষের চরিত্রে পুনর্বিকাশ। যেমন বিভিন্ন জাতের পোষা খরগোশের মিশ্রণে উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং ও চেহারার সাদৃশ্য থাকবে। অষ্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী মেণ্ডেল (১৮২২ ৮৬) কয়েকটি ভিন্ন জাতীয় মটরগাছ নিয়ে এই পরীক্ষা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের নাম 'Mendel's Law of Heridity'। স্বামীজীর হয়ত এ বিষয়ের কথা মনে ছিল।

'প্রাণ' প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি বলেছেন, 'প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। যে পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে পারেন।'

স্বামীজীর এই কথাটি পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষিত সত্য। শব্দ-বিজ্ঞানে একে Resonance বা 'অনুনাদ' বলে। যদি দু'টি তার সমতানে বাঁধা থাকে, তাহলে একটিকে আঘাত করলে অন্যটিও বেজে উঠবে।

যোগী যোগসাধনবলে নিজের দেহ পরিবর্তন করতে পারেন এমন একটা কথা চালু আছে। স্বামীজী এ ঘটনাকে অযৌক্তিক বলেননি। তিনি বলেন, মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে পূর্বাবর্তিত

পথে চলতে ভালবাসে। কথাটিকে বিশদভাবে বোঝানর জন্য তিনি শারীরবিজ্ঞানের উপমা গ্রহণ করলেন--[৬]

'দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়—মন একটি সূচি আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডমাত্র, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ[৭] ঐ পথটিকে পৃথক রাখিবার জন্য উহার একটি সীমানা প্রস্তুত করিয়া দেয়। যদি ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত না। কারণ স্মৃতির অর্থ পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগা বুলান। . .'

আর এক স্থানে দেখা যায়, তিনি পরমাণুর গঠন প্রণালীর কথা তুলেছেন। তিনি বলেন, জগৎ মনের বিকাশ। 'ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে একটি পরমাণুর গঠন প্রণালী জানিতে পারিলে আপনি সমগ্র জগতের গঠন প্রণালীই জানিতে পারিবেন।'[৮]

ইলেকট্রন মতবাদ অনুসারে পরমাণুর গঠন প্রণালী মোটামুটি এরূপ: কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের (প্রোটন -ধনাত্মক তড়িৎ বিশিষ্ট)

৬. 'সমাধিপাদ', স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড।

৭. To the naked eye, certain portion of the Brains and Spinal Cord appear grey and others white, when freshly cut sections are examined. Grey matter is composed largely of nerve cells, while white matter contains only long processes, nerve fibres. It is in the former that the nervous impressions are received, stored and transformed into impulses, and by the latter they are conducted. Grey's Anatomy.

৮. প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত: স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড।

চারিদিকে কতগুলি ইলেকট্রন (ঋণাত্মক তড়িৎ বিশিষ্ট) ঘুরছে। সৌরজগৎ বা নক্ষত্রজগতের গঠন প্রণালী অনুরূপ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অন্ততঃ সৌরজগতের বিষয়টি যে একই রকমের তা জানা গেছে। এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্রের চারদিকে ক্ষুদ্রতর শক্তিপুঞ্জ ঘুরছে।

বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর ইলেকট্রন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সাহায্য নিয়েছেন নিজ বক্তব্য প্রাঞ্জল করবার জন্য। 'চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, 'যখন কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুগুলির অবস্থান নলের ভিতর দিয়া নানা রঙের কাচখণ্ডের দ্বারা দৃষ্ট কারুকার্যের ন্যায় হইয়া থাকে (Kaleidos-copic)। মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুগুলির ঐরূপ সংস্থাপন ও সংযোগের পুনঃপ্রাপ্তিই 'স্মৃতি' বলিয়া অভিহিত হয়।'

'ওজঃশক্তি' নিবন্ধে তিনি বলেছেন, যোগীর কাছে যা 'সহস্রার,' শারীরবিজ্ঞানে তা Pineal gland হতে পারে। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কে অবস্থিত। স্বামীজী বলেছেন, 'স্নায়ুচক্রের সর্বনিম্ন প্রান্তে যৌনকেন্দ্র—মূলাধারে অবস্থিত (Sacral plexus)*। শরীরের মধ্যে যে দুই প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়ে মেরুদণ্ডের দু'পাশ দিয়ে নীচে চলে গেছে তার দ্বারা সঞ্চালিত শক্তির গতি নিম্নাভিমুখী এবং তার অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়।'

এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন চক্রের (স্নায়ুচক্র)

---

* Sacral plexus : কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল, মূলাধার বা মূলাধারের কাছে বহু স্নায়ু জালের গ্রন্থি।

Sacral plexus is formed by the lumbo-sacral trunk, the anterior primary rami (branches) of the first, second and third sacral nerves, and part of anterior primary ramus of the fourth sacral nerve Grey's Anatomy, 30th Edn.

সঙ্গে বৈজ্ঞানিক স্নায়ুমণ্ডলীর সামঞ্জস্য বিধান করবার চেষ্টা করব। প্রথমে 'সুষুম্না' নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের মধ্যকার 'কাণ্ড'। একে সুষুম্না কাণ্ড বলা হয়। ডানদিকের ও বাঁ দিকের 'স্বতন্ত্র স্নায়ু (সমবেদী স্নায়ু) গ্রন্থির (Sympathetic nerve ganglia) দু'টি শৃঙ্খলকে বলা হয় 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা'। এই সমবেদী স্নায়ুসমূহ সৌরচক্রে (Solar plexus--ভানুভবন, নাভিচক্র) সুষুম্নার সঙ্গে মিলিত হয়।

যোগীরা সাতটি চক্রের কথা বলেছেন। তান্ত্রিকেরাও তা অনুসরণ করেন। নীচ থেকে উপরের দিকে সেগুলি হ'ল[৯]—

প্রথম— মূলাধার [মেরুদণ্ডের নীচে]
দ্বিতীয়— স্বাধিষ্ঠান [উদরের নীচে]
তৃতীয়— মণিপুর [নাভিদেশে]
চতুর্থ— অনাহত [বক্ষে বা হৃদয়ে]
পঞ্চম -- বিশুদ্ধ [কণ্ঠে]
ষষ্ঠ— আজ্ঞাচক্র [ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে]
সপ্তম – সহস্রার [মস্তকে]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সব চক্রের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে সাতটি চক্রের কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য তা আচার্য শীলের অনুগামী।

(১) মূলাধার চক্র—এটি হ'ল Sacro-coccygeal plexus। এর চারটি শাখা আছে। সৌর চক্র (Solar plexus, কাণ্ড, ব্রহ্মগ্রন্থি) থেকে এগার 'অঙ্গুলি' (প্রায় নয় ইঞ্চি) নীচে।

(২) স্বাধিষ্ঠান চক্র –একে Sacral plexus বলা যেতে পারে। এর ছ'টি শাখা। যৌন উত্তেজনা, যৌন বোধ, সেই সঙ্গে অবসাদ, অসাড়তা, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহপ্রবণতা, ঘৃণা প্রভৃতির কেন্দ্র এখানে।

---

৯. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২।

(৩) মণিপুর চক্র—এই চক্রের কথা বলার আগে প্রথমে নাভিকাণ্ডের কথা বলা দরকার। নাভিকাণ্ড সৌর গ্রন্থি বা ভানুভবনের অনুসারি (corresponding)। ডান ও বাম সমবেদী স্নায়ুর শৃঙ্খলের (পিঙ্গলা ও ইড়া) সঙ্গে সেরিব্রো-স্পাইনাল অক্ষের সংযোগ সাধন করে। এরই সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল মণিপুর চক্র। এটি লাম্বার প্লেক্সাস (Lumber plexus)। তৎসহ সংযোগকারী সমবেদী স্নায়ু। এর দশটি শাখা—নিদ্রা, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, লজ্জা, ভয়, নিশ্চলতা ইত্যাদি প্রকাশের উৎস।

(৪) অনাহত চক্র—সমবেদী স্নায়ু-শৃঙ্খলের 'কার্ডিয়াক প্লেক্সাস'। এর বারটি শাখা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলি অহংবোধ, আশা, উদ্বেগ, সন্দেহ, প্রবঞ্চনা, অস্মিতা প্রভৃতি প্রকাশ করে।

(৫) বিশুদ্ধ—একে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ভারতীস্থান মেডালা অবলংগেটার (Medulla oblongata) সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের—সংযোগস্থল। এটি কয়েক ধরনের স্নায়ুর সাহায্যে যেমন ('নিউমোগ্যাষ্ট্রিক')—এদের সাহায্যে ল্যারিংস এবং সন্নিহিত কয়েকটি যন্ত্রকে (organ) নিয়ন্ত্রিত করে।

(খ) লালনচক্র—আলজিভের বিপরীত দিকে। এর বারটি পত্র (leaves) আছে। অহংবোধ, আত্মশ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভাবপ্রবণতা, অহংকার, দুঃখ, অনুশোচনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তৃপ্তি প্রভৃতি অনুভূতি সৃজিত হওয়ার কেন্দ্র।

(৬) আজ্ঞাচক্র- আজ্ঞাচক্র ও মানসচক্র হ'ল Sensory-motor tract।

আজ্ঞাচক্র দু'টি ভাগে (lobe) বিভক্ত। এখানে থেকে যাবতীয় অঙ্গচালনা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানসচক্রের (the sensorium) ছ'টি অংশ। পাঁচটি হ'ল

বিশেষ সংবেদী (Sensory) স্নায়ু—অনুভূতির জন্য। একটি স্বপ্ন, দৃষ্টিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন ইত্যাদির কেন্দ্র।

একই সঙ্গে আরো একটি চক্রের কথা বলব। তা হ'ল সোমচক্র। ষোলটি ভাগ বিশিষ্ট গ্যাংলিয়ন। সেনসোরিয়ামের উপরে গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রামের মধ্যভাগের কেন্দ্রসমূহ রচনা করে। করুণা, ভদ্রতা, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, আগ্রহ, দৃঢ়তা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎসস্থল।

(৭) সহস্রার—সহস্রদল ভাগ বিশিষ্ট। ভাগ ও ভাঁজ (Convolution) সমেত গুরুমস্তিষ্কের উপর দিক। জীব বা জীবাত্মার বিশেষ ও সর্বোচ্চ আসন।

'আত্মার পুনর্দেহধারণ'—সম্বন্ধে হিন্দু মতবাদ কি তার উত্তরে স্বামীজী যা বলেছেন তার সঙ্গে আধুনিক বিশ্ব-তত্ত্বের মিল আছে। তিনি বলেছেন —বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (Conservation of Energy or Matter) মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এটিও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ আমাদের দেশের কোন দার্শনিক প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকেরা সৃষ্টি বিশ্বাস করতেন না। 'সৃষ্টি' বললে কি বোঝায় -'কিছু না' থেকে 'কিছু' হওয়া। কিন্তু তা অসম্ভব। যেমন কালের আদি নেই, তেমনি সৃষ্টিরও আদি নেই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দু'টি রেখার মত। তাদের আদি, অন্ত নেই। সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁদের মত হচ্ছে—এ ছিল, আছে ও থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন, প্রমাণ করেছেন ভারতের প্রাচীন ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বিদেশীদের ভ্রান্ত মতবাদের নিরসন করেছেন স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে। স্বামীজীর এই দিকটি নিয়ে বিশেষ আলোকপাতের প্রয়োজন আছে। তার আগে মনোবিজ্ঞান যাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা ক'রব।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা বর্তমান, স্বামীজী তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য বিজ্ঞানেব মত এই বিজ্ঞানকেও উপযোগিতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয় এবং তাব ফলে তার স্থান অনেক নীচে। এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্য উচ্চার্য যে, বিবেকানন্দের সময় থেকে আজকের দিনে সেখানে মনোবিজ্ঞানের আসন অনেক সুদৃঢ। মনোবিজ্ঞানকে তিনি সেরা বলেছেন। যেহেতু আমবা সকলেই ইন্দ্রিয়েব দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস এবং অনেক সময়েই দেখা যায় আমরা দাস হয়ে পড়ি শোচনীয়ভাবে। ইন্দ্রিয়গুলিব দাসত্ব জগতের সকল দুঃখের কারণ। মনের উচ্ছৃঙ্খল নিম্নগতিকে কেমন ক'রে দমন করা যায়, কিভাবে তাকে ইচ্ছাশক্তিব আয়ত্ব করা যায় এবং তার দোর্দণ্ড প্রতাপ থেকে নিজেকে বিমুক্ত বাখা যায়, মনোবিজ্ঞান তারই শিক্ষা দেয়। একাবণেই তিনি মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন।

অসংযত উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদেব ক্রমাগতভাবে নীচু দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের ধ্বংস কবে; আর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন আমাদেব রক্ষা করবে, মুক্তিদান করবে। অতএব মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া চলতে পারে এই কথা স্বামীজী বলতেন।

যে কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ কববার জন্য প্রচুর তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। সেই সব তথ্য ও উপাদান বিশ্লেষিত করে এবং নানা পরীক্ষাব মাধ্যমে ঐ সব বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মনের অনুশীলন ও বিশ্লেষণে বাইরের কোন তথ্য ও

উপদান পাওয়া যায় না। এ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে জটিল। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন[১] :

'পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফললাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।'

১৯০০ সালের ৮ই জানুয়ারি লস্‌এঞ্জেলস্‌-এ 'মনের শক্তি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, যাঁর মনের শক্তি যত বেশী তিনি তত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এই মানসিক শক্তি বা ব্যক্তিত্বকে আমাদের পরিচিত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না। রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মানসিক শক্তি ক্ষেত্র বিশেষে অসীম। এই ঘরের এক কোণে বসে পাশের ঘরের লোকটির মনের খবর টের পাওয়ার শক্তি জড়বিজ্ঞানীদের নেই। তাঁরা এ ধরনের ঘটনাকে স্বীকার করেন না। বিজ্ঞানের কাজ হ'ল তথ্য সংগ্রহ করা, সামান্যীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্ত্বে হাজির হওয়া ও সত্য প্রকাশ করা। কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার ক'রে চলতে শুরু করলে বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠবে কেমন ক'রে?

---

১. মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব।

একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করতে পারে তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে একবার অনুরক্ত হলে সে সব কিছু ভুলে তাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে। ভারতেও তাই হয়েছে। ভারত বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, গণিতের আরম্ভ সেখানে। এখন পর্যন্ত সংস্কৃত গণনা অনুযায়ী বিশ্বের মানুষেরা ১, ২, ৩ থেকে গণনা করছে। সকলেই জানে, বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে। স্বামীজী এসব কথা বলে জানালেন যে, নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানত।

> 'ইতিপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, তখন তেমনি যথানিয়মে এই বিজ্ঞানটিও (মনোবিজ্ঞান) শিখাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জাতির এত বেশী দৃঢ় প্রত্যয় আসিয়াছিল যে, তাহার ফলে জড়-বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল।'

জড়বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়বস্তু গতিহীন। চেয়ারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি, এ আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে যাবে না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মন, তা সদা চঞ্চল। যে কোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয় এর জন্য। মনোবিজ্ঞান ও আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে তা স্বামীজী বলেছেন। তিনি উভয়ের মধ্যে 'সাদৃশ্য' অবস্থা অনুভব করেছেন। ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের উল্লেখ করেছেন।

> এই মনোবিজ্ঞান বিষয়ানুভূতির যে প্রণালী বলেছে তা হ'ল—'প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত

করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—উহাকে তাঁহারা 'আত্মা' বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্র সমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্র সমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যারা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ক কেন্দ্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই।'[২]

'মন' সম্বন্ধে স্বামীজী বেশ সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মন এবং বস্তু বা matter-এ কোন তেমন পার্থক্য নেই। একটি থেকে আর একটি লাভ করা যায়, একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে তিনি বিয়ষটি পরিষ্কার করেছেন[৩]—

'Take a bar of steel and charge it with a force sufficient to cause it to vibrate, and what

২. জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ।

৩. Nature and Man : Complete Works, Vol.

would happen? If this were done in a dark room, the first thing you would be aware of would be a sound, a humming sound. Increase the force, and the bar of steel would become luminous; increase it still more, and the steel will disappear altogether. It would become mind.'

কেবল মাত্র মনোবিজ্ঞানেই নয়, জড়বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। তারই ফলশ্রুতি অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা।

ভারতবর্ষ ধর্মকে বিজ্ঞানরূপে দেখেছিল। জুলিয়ান হাক্সলি তাকেই বলেছেন, 'a science of human possibilities'। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেব। বিগত ১৯০০ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ এঞ্জেলস্ শহরে স্বামী বিবেকানন্দ 'মনের শক্তি' ('The Powers of the Mind') শীর্ষক একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন:

'এখন এমন এক মতের কথা বলছি, যা নিয়ে এখন কোন বিচার করব না, শুধু সিদ্ধান্তটি ব'লে যাব। কোন জাতি যে-সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, সেই জাতিকেই শৈশব অবস্থায় ঐসব অবস্থা দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে আসতে হয়। যে-সব অবস্থা পার হয়ে আসতে একটা জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হয়েছে, সে-সব পার হ'তে শিশুটির প্রয়োজন মাত্র কয়েক বছরের—এইমাত্র প্রভেদ।......এখন সব মানুষকে একটি জাতি ধরলে অথবা সমগ্র প্রাণিজগৎকে—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণিদের একটি সমগ্র সত্তা বলে ভাবা যাক্। এমন একটা

লক্ষ্য আছে, যার দিকে এই জীব-সমষ্টি অগ্রসর হচ্ছে। এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা বলা যাক্।

এমন অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, যাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ উন্নতির পূর্বাভাস সূচিত হয়। সমস্ত মানবসমাজ যতদিন না পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, যুগ যুগ ধরে বারে বারে জন্ম ও পুনর্জন্ম না নিয়ে, তাঁরা তাদের স্বল্প জীবনের কয়েক বছরের মধ্যেই যেন দ্রুতগতিতে সেই যুগ-যুগান্তর অতিক্রম ক'রে যান। আর একথাও আমাদেব জানা আছে যে, আমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা (আন্তরিকতা) থাকলে প্রগতির এই প্রণালীসমূহ খুবই ত্বরান্বিত করা যায়। শুধু জীবন ধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে কয়েকটি সংস্কৃতিহীন লোককে যদি কোন দ্বীপে বাস করবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলেও তারা ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর সভ্যতার উদ্ভাবনে সচেষ্ট হবে। একথাও আমরা জানি যে, অতিরিক্ত সাহায্য পেলে এই উন্নতি আরো দ্রুতবেগসম্পন্ন হয়।

আমরা গাছপালা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করি ; করি না কি ? প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলেও গাছগুলি বেড়ে উঠত, তবে দেরী হ'ত। সাহায্য ছাড়া যতদিনে বাড়ত, তার চেয়ে কম সময়ে বাড়বার জন্য আমরা তাদের সাহায্য করি। একাজ আমরা সব সময় ক'রে চলেছি। কৃত্রিম পন্থায় বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর ক'রে তুলছি। (তাহলে) মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করতে পারব না কেন ? জাতি হিসাবে আমরা তা করতে পারি। অন্য দেশে প্রচারক পাঠান হয় কেন ? যেহেতু এই উপায়ে অন্য জাতিসমূহকে তাড়াতাড়ি উন্নত করা সম্ভব। তাহলে ব্যক্তির উন্নতিও কি

আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারি না ? পারি বই কি। এই উন্নতির দ্রুততার সীমা কি নির্দেশ করা যায় ? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হবে, কেউ তা বলতে পারে না।

……কোন মানুষ মাত্র এই পর্যন্ত উন্নত হতে পারে, তার বেশী পারে না, একথা বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। পরিবেশ বিস্ময়করভাবে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের আগে কোন সীমা টানা যায় কি ? এতে কি বোঝা যায় ? (একথাই বোঝা যায়) যে, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পরে সমগ্র জাতি যে ধরনের মানুষে পূর্ণ হবে, সেই ধরনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ আজ অবতীর্ণ হতে পারেন। যোগীরা একথাই বলেন। তাঁরা বলেন যে, বড় বড় অবতার পুরুষ এবং আচার্যেরা এ ধরনেরই মানুষ— তাঁরা এই এক জীবনেই পূর্ণতালাভ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালে আমরা এজাতীয় মানুষের দর্শন পেয়েছি। সম্প্রতি এমন একজন মানুষ এসেছিলেন, (শ্রীরামকৃষ্ণ) যিনি এ জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন।

এই যে উন্নতি দ্রুতবেগ হওয়ার ঘটনা তাও নিয়মাধীন। মনে করা যাক্ আমরা এই নিয়মগুলি অনুসন্ধান করতে পারি, তাদের রহস্য অনুধাবন করতে পারি এবং নিজের প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগাতে পারি। এরূপ করতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। উন্নতির বেগ দ্রুততর ক'রে, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত ক'রে এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা অর্জন করতে পারি। এটিই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক, এবং যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মন ও তার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ।……

এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা হচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মত বহিঃপ্রকৃতির হাতের পুতুল হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে অপেক্ষা করতে না দিয়ে তার পূর্ণত্বকে প্রকট ক'রে দেওয়া। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে না দিয়ে কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলে নাও, আর এই ক্ষুদ্র জীবনের উর্ধ্বে চলে যাও। এই হচ্ছে তার মহান উদ্দেশ্য।[৪]

৪. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol II, pp 18-19, 9th Edn. [অনূদিত]

বিবেকানন্দের নৃতাত্ত্বিক মতবাদ

নৃতত্ত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব মতবাদ আছে তা হয়ত অনেকের জানা নেই। পৃথিবীর নানা জাতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা অল্প হলেও ভারতীয় নৃতত্ত্ব বা Indian Anthropology-তে তাঁর অবদান যথেষ্ট। এ বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন কিনা জানিনে। না হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেহেতু বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদেরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন তিনি তার বিরোধিতা করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য [১] :—

> 'Swami Vivekananda was the first Indian to raise his voice against false foreign propaganda. But India hearkened him not. ("A white man" was still divine in India of that time.) And our scientists and so-called historians had to kow-tow to their foreign masters for the sake of their self-existence. On this account, all erroneous and disparaging theories about India and her civilisation are still current in the country. It is to be hoped that in independent India, in future, thinkers and scientists with independent mind will give a proper evaluation of their country and culture.'

প্রথমে দক্ষিণ ভারতের 'দ্রাবিড়' প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি মতে বলা হয় যে, দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তনিবাসী আর্যগণ থেকে সম্পূর্ণ

---

১. Dr. B. N. Datta : Swami Vivekananda, Patriot-prophet.

পৃথক দ্রাবিড় জাতির বসবাস ছিল। দাক্ষিণাত্যের এই ব্রাহ্মণরা শুধু আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ থেকে উৎপন্ন। কাজেই দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বামীজী বলেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা[২] যাই বলুন না কেন, এই মতবাদ তিনি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে ; কিন্তু আর কোন প্রভেদ তো দেখা যায় না। পূর্বোক্ত মতবাদীরা বলেন যে, দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্ত থেকে যখন আসেন তখন তাঁরা সংস্কৃতভাষী ছিলেন। এখন এখানে এসে দ্রাবিড় ভাষা বলতে বলতে সংস্কৃত ভুলে গেছেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে একথা সত্য হয়, তাহলে অন্যান্য জাতির সম্পর্কেই বা একথা খাটবে না কেন? অন্যান্য জাতিও আর্যাবর্ত নিবাসী ছিল, তারাও দাক্ষিণাত্যে এসে সংস্কৃত ভাষা ভুলে দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছে—এ কথাই বা বলা যাবে না কেন? স্বামীজী বলেন, যে যুক্তির সাহায্যে বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য বলে প্রমাণ করতে যাচ্ছেন, সেই যুক্তির সাহায্যেই তাদের আর্য বলে প্রতিপন্ন করা যায়। হতে পারে দ্রাবিড় নামে কোন জাতি ছিল—কিন্তু তারা এখন লোপ পেয়েছে। যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা বনজঙ্গলে বাস করছে। স্বামীজী মনে করতেন খুব সম্ভবতঃ ঐ দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সকলেই আর্য, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছে। সমগ্র ভারত আর্যময়।

অনেকে বলেন শূদ্রেরা অনার্য জাতি। তারা আর্যদের দাস। এ কথা যে মিথ্যা তা তিনি 'ভারতের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন—

'শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক

---

২. প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে স্বামীজী নৃতত্ত্ববিদ্‌দেরই বুঝিয়েছেন।

ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্যদের চাটনির মত খাইয়া ফেলিত। জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।'

স্বামীজী এইভাবে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্যার সঠিক স্থানে আঘাত করেছেন। যতদিন আমরা বৃটিশ-শাসকের অধীনে ছিলাম ততদিন ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ববিদ্যা সঠিকভাবে রচিত হয়নি। সেকালে বিদেশী শাসকেরা তাদের খুশিমত বিজ্ঞান রচনা করে এদেশে চালাত। বিশপ ক্যাল্ডওয়েল নামক এক ব্যক্তির আবিষ্কার 'দ্রাবিড় জাতি'। ইনি ভাষার উপর নির্ভর করেছিলেন। এখন, নৃতত্ত্ববিদেরা বলছেন যে জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রাক্-দ্রাবিড়িয়দের 'Veddid' বলতেন। জার্মান বিজ্ঞানীরা দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। বিশিষ্ট জার্মান নৃতত্ত্ববিদ E. Von Eickstedt দক্ষিণ ভারতীয়দের 'ভূমধ্যসাগরীয়' আখ্যা দিয়েছেন। একই ধরনের কথা উত্তর ভারতীয়দের[৩] সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাছাড়া শূদ্র যে অনার্য সম্ভূত এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'মনু' বলেছেন তারা 'আর্য'। পরীক্ষার ফলেও এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। স্বামীজীর কথায়[৪]—

---

৩. Dr. B. N. Datta এর 'Races of India' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

'আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাত বর্ণসাঙ্কর্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কালো-সাদার আসল কারণ পৈত্রিক। এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ্, পহ্লব, যবন ও খশ্—এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি—এঁরা হচ্ছেন আর্য। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি—এ বর্তমান 'চীনেম্যান' নয়। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাও—যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে পাহাড়ী জাতসকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু-দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান।··হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধহয় 'হিউন'। মনূক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী তো নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য হূন এবং মধ্য আশিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ড্যুক্ ড অর্ লিআঁ নামক রুশ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য-মুখচোখ বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়।

'যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম।···'পহ্লব' শব্দে পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। 'খশ্' শব্দে এখনও অর্ধসভ্য পার্বত্য দেশবাসী আর্যজাতি—এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইউরোপীয়রাও এই অর্থে খশ্‌দের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্যজাতি প্রাচীন-কালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত। যেখানে রঙ্ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এঁদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকি সব খিচুড়িজাত, নইলে কালো কেন হ'ল? কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।'

এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উত্তর ভারতে অনেক বালকের ধূসর বর্ণের চুল দেখা গেছে। তা অনেকটা Eugene Fischerএর তালিকার ২৭নং রঙ্ (shade) থেকে অনেকটা হাল্কা। প্রাচীন-কালে পিঙ্গল বর্ণের চুল প্রায়ই দেখা যেত। এ প্রসঙ্গে Dr. B. N. Datta এর 'Note on the presence of light colored eye-iris amongst the population of North Eastern India' পঠিতব্য।

স্বামীজী বলেন 'এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য, ব্যস্। কালো ব'লে ঘৃণা হয়, ইউরোপীয়রা অন্য নাম নিনগে। কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। এ কথা জগৎ প্রসিদ্ধ।'[৫]

৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

এখানে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য[৬]—

'Anthropology is a new subject in the field of enquiry. It is regarded as an abstract science. Except somatological part of it, most of it is speculative (Nobody has as yet been able to give a clear exposition of the cause of the origin of skin-color, contour of the head, nose etc. amongst different races of mankind). The most unfortunate part of anthropology is that during its inception, it got enmeshed in national chauvinism of each country. Moreover, during the colonial epoch of the latter part of the nineteenth and early twentieth centuries, anthropology became the hand-maid of the politicians of the imperial occidental countries'.

হিন্দু ও গ্রীক দুটি জাতি একই মূল জাতি থেকে উৎপন্ন একথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন যে বিভিন্ন দেশ কাল ঘটনাচক্রে এরা স্থাপিত।

'উত্তরে হিমাচলের হিমশিখর সীমাবদ্ধ, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যাণী ও সমতলে প্রবহমান সমুদ্রবৎ বিশাল স্বাদুসলিলা স্রোতস্বতী-বেষ্টিত ভারতীয় আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখ হইল। আর্যজাতি সহজেই অন্তর্মুখ, আবার চতুর্দিকে এই-সকল মহাভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবগ্রাহী মস্তিষ্ক স্বভাববশেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপরদিকে গ্রীক জাতি জগতের এমন

---

৬. 'Swami Vivekananda' p. 349.

এক স্থানে বাস করিত, যেখানে গাম্ভীর্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের বেশী সমাবেশ—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিকের নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল। উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিতে চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই ভারত হইতে সর্ব-প্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।···

···অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্য-ক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশ বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের ভারত বিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল হইয়াছে; ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী; ইওরোপের সব কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা বলিতেছে; উহার প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক আসবাবটিতে পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ; ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। ···"[৭]

এখানে স্বামীজী হেলেনীক এবং ইণ্ডো-এরিয়ান মনের বিকাশের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। যদিও জাতিগতভাবে তারা অনেকটা এক, তাহলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে তারা কিভাবে বেড়ে

৭. আমাদের উপস্থিত কর্তব্য: স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড।

উঠেছে তার বিস্তৃত ইতিহাস এ রচনায় পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি একথাও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে, তুর্কি-মুসলমান আক্রমণের আগে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি কেমনভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আবার পুনর্জাগরণের কথাও বলেছেন।

'সমাজের ক্রমবিকাশ', 'দেবতা ও অসুর', 'দুই জাতির সংঘাত' প্রবন্ধত্রয় থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে স্বামীজীর নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের আরো পরিচয় দেওয়া চলে। 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধটি নৃতত্ত্ব বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

> 'সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকিপাথরের অস্ত্র-শস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয় কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্র-সজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়া-জীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড়, আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিক-গণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা—উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান —এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান,

চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।'

১৯০০ সালের ১৯শে মার্চ, সোমবার 'ওকল্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার' পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ স্বামীজীর 'ভারতের মানুষ' শীর্ষক ভাষণের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। ভাষণের আগে তিনি শ্রোতাদের কাছে ভারতবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ইওরোপে ভারতের ঐক্যের বন্ধনের মূল সূত্রটির পার্থক্য দেখিয়ে বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতে ঐক্যের বন্ধন হল ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী (race) নয়। ইওরোপে গোষ্ঠী নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায় যদি ধর্ম এক হয়, তাহলে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত ও বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে। তিনি বলেন—উত্তর-ভারতের মানুষকে চারটি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উত্তরভারতের লোকরা মহান্ আর্যজাতিসম্ভূত—যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার বাস্‌ক জাতি এবং ফিন্ জাতি ছাড়া সমস্ত ইওরোপের মানুষ উদ্ভূত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ ভারতীয়দের দ্রাবিড় অর্থাৎ 'আর্য' থেকে স্বতন্ত্র, এবং 'শূদ্র'দের অনার্য বলে অভিহিত করবার অসৎ প্রচেষ্টা বিদেশী শাসকেরা করেছিল, সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দই সোচ্চারে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেছেন[৮]—

> 'দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আর্য'-মতবাদের জাল এবং ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলি শান্ত অথচ দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

৮. আর্য ও তামিল, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড।

সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির পূর্ববর্তী মহান্ তামিল-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্র সমূহে 'আর্য' শব্দটি যে অর্থে দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসংঘকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়—সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ-কথা সব হিন্দুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রনে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে।'

* * *

'তিনি* যে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো—সুমেরীয়গণের জাতিগত—ঐক্য সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়েছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার সহিত তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্ত সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি।

আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্টুই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার-তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের তীর ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পন্টুকে তাহারা পবিত্র-ভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত। এই প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলিয়াছে।'

---

* Pandit D. Savariroyan.

এখানে স্বামীজী সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী 'আর্য' ও 'দ্রাবিড়' জাতির মধ্যে বিবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদেরা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সুমেরো-আক্কাদীয় শব্দের অস্তিত্বের কথা বলছেন। তাঁরা আরও বলছেন যে, বেদ ইত্যাদির মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় শব্দও খুঁজে পাওয়া গেছে। এ সমস্ত বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, স্বামীজী ভারত সংক্রান্ত সর্বাধুনিক নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল ছিলেন।

বিদেশীরা যে আমাদের দেশে তাদের খুশিমত মতবাদ চাপিয়ে দিয়ে গেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যায় বিগত ১৯৫৩ সালে 'হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেস'এর সভাপতি ডঃ পি. ভি. কানের বক্তৃতা থেকে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখবার মত যে, জার্মান বিজ্ঞানীরা কখনই 'দ্রাবিড়' জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। ইংরেজ বিজ্ঞানী Haddon বলেছেন,

> 'Apart from dark-color of skin, there are many points of resemblance between the Dravidians and Mediterranean peoples.'

[চর্মের গাঢ় (কৃষ্ণ) বর্ণত্ব ছাড়াও দ্রাবিড় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। —অনূদিত]

দুঃখের কথা ইংরেজদের মতকেই আমরা স্বীকার করে এসেছি। সভাপতির ভাষণে ডঃ কানে বলেছেন—

> 'Speaking with greatest respect for the industrious and learned scholars of the west, I cannot help observing their conclusions are extremely one-sided and that they have often built huge structures on very meagre foundations made too much of very disputable evidence and it is to be regretted that many western writers and Indian scholars also have

blindly followed in the wake of the pioneers and added their own imaginary conclusions without carefully and cautiously weighing the evidence offered and the probabilities.'

[পাশ্চাত্যের নিষ্ঠাবান ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও একথা না বলে পারা যায় না যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ একতরফা এবং এতবড় একটা জটিল বিষয়ের সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য পেয়ে তারই উপর তাঁদের কল্পনার ইমারত তৈরী করেছেন। (যে বিষয় নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলেছে সেই বিষয় সম্পর্কে অতি অল্প জেনে সিদ্ধান্ত তৈরী করেছেন) দুঃখের কথা এই যে, বহু পাশ্চাত্য লেখক ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে তাঁদের ঐ পূর্বসূরীদের ভ্রান্ত-ধারণাকে অন্ধ-অনুসরণ করে গেছেন। যে সব যুক্তি দেখান হয়েছে তা ভালভাবে যাচাই না করেই তাঁরা এরই সঙ্গে নিজেদের কাল্পনিক সিদ্ধান্ত সংযোজিত করেছেন। —সারানুবাদ]

ভারতের নৃতত্ত্ব নিয়ে স্বামীজীর চিন্তার প্রখরতা আমাদের বিস্মিত করে। বহু জটিল তত্ত্বের তিনি যেভাবে সমাধান করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধার বস্তু। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। অধীনতামুক্ত ভারতে তার নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পুনরায় পর্যালোচনা করবার লগ্ন সমুপস্থিত।

স্বামীজীর মত ক্রমেই আদৃত হচ্ছে। সেকালে যে সব বিজ্ঞানী স্বামীজীর বক্তব্যকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিদেশী বিজ্ঞানীরা ও ভারতের গৌরব আচার্য জগদীশচন্দ্র।

ভারতের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ পঠনীয়।

১. Historie de L'Asie Anterieure : de L' Inde et de La Crete, 1947.
২. S. Feist : Germannen and Indo-Germannen.
৩. Modern Review, May 1954.

স্বামীজী ও বিদেশী বিজ্ঞানী

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান প্রীতির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে বিফল হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে বিজ্ঞানচর্চার পাঠ নিয়েছিলেন। পরে গৃহ-শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রাধান্য কম ছিল না। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানীদেব সাহচর্য তাঁকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে সহায়তা করেছে একথা বললে অস্বাভাবিক হবে না। কিন্তু বিবেকানন্দের এ ধরনের কোন সুযোগ ছিল না। তবুও তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতি ক্রমেই তীব্র হয়ে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একথা সত্য যে, তিনি কলেজে বিজ্ঞান পড়েননি, কিন্তু কি বিদেশে, কি স্বদেশে, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য তিনি অধ্যয়ন এবং সহজাত উপলব্ধির বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

আমেরিকায় এবং লণ্ডনে অনেক বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। সকলের সঙ্গে তাঁব কথাবার্তার অনুলিপি নেই। চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় কয়েকজনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ম্যাকসিম-কামানের আবিষ্কর্তা **হিরাম ম্যাকসিম** স্বামীজীর অধিকাংশ বক্তৃতাব সময় উপস্থিত থাকতেন। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানী ম্যাকসিম স্বামীজীর সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন[১]—

'A few years ago there was a Congress of

১. Li Hung Chang's Scrap Book : by Sir Hiram Stevens Maxim. London, Watts & Co., 1913.

Religion at Chicago. Many said that such a thing would be impossible. How could any understanding be arrived at where each particular party was absolutely right and all the others ware completely in the wrong ? still the Congress saved the American people more than a million dollars a year, not to mention many lives abroad. And this was all brought about by one brave and honest man. When it was announced in Calcutta (?) that, there was to be a Congress of Religions at Chicago, some of the rich merchants took the Americans at their word, and sent them a ...monk, Vivekananda, from the oldest monastery in the world. This monk was of commanding presence and vast learning, speaking English like a Webster. The American Protestants, who vastly outnumbered all others, imagined that they would have an easy task, and commenced proceedings with the greatest confidence, and with the air of 'Just see me wipe you out'. However, what they had to say was the old commonplace twaddle that had been mouthed over and over again in every little hamlet from Nova Scotia to California. It interested no one, ane no-one noticed it.

When, however, Vivekananda spoke, they saw that they had a Napoleon to deal with. His first speech was no less than a revelation. Every word was eagerly taken

down by the reporters, and telegraphed all over thc country, when it appeared in thousands of papers. Vivekananda became the lion of the day. He soon had an immence following. No hall could hold the people who flocked to hear him lecture. They had been sending silly girls and half-educated simpletons of men and millions of dollars to Asia for years, to convert the poor benighted heathen and save his alleged soul ; and here was a Specimen of the unsaved who knew more of philosophy and religion than all the persons and missionaries in the whole country. Religion was presented in an agreeable light for the first time to them. There was more in it than they had ever dreamed ; argument was impossible. He played with the persons as a cat plays with a mouse. They were in a state of consternation. What could they do ? What did they do ? What they always do—they denounced him as an agent of the devil. But the deed was done ; he had *sow* the seed, and the Americans commenced to think. They said to themselves ; 'Shall we waste our money in sending missionaries who know nothing of religion, as compared with this man, to teach such men as he ? 'No !' And the missionary income fell off more than a million dollars a year in consequence.'

(কয়েক বছর আগে শিকাগোতে ধর্মমহাসম্মেলন হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন এ ধরনের সম্মেলন হওয়া অসম্ভব। যেহেতু

প্রতিটি সম্প্রদায় নিজেদের মতকে অভ্রান্ত ও অপরের ধর্মমতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে করেন, সেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কেমন ক'রে? তাহলেও এই সম্মেলন আমেরিকাবাসীদের বছরে এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাঁচিয়ে দিয়েছিল এবং অনেককে বিদেশে গিয়ে বাস করবার কষ্ট থেকে তো বটেই। এবং তা হয়েছিল একজন সাহসী ও সৎ-মানুষের জন্য। যখন কলকাতায় (?) ঘোষিত হলো যে শিকাগোতে এক ধর্মমহাসম্মেলন হবে···তখন [অন্যান্যদের মধ্যে] পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসম্প্রদায় থেকে বিবেকানন্দ এলেন। এই সন্ন্যাসীর আত্মাব্যঞ্জক চেহারা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ইংরেজী বলেন ওয়েবষ্টারের মতো। সমবেত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকার প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় মনে করেছিলেন সম্মেলনের কাজ সহজ এবং একারণেই তাঁরা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সভার কাজ পরিচালনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ভাবখানা ছিল অনেকটা এরকম—'আমার কাছে একবার এস, মুহূর্তেই উবে যাবে।' যাহোক, যখন তাঁরা তাঁদের সেই পুরোনো বুলি কপচাতে লাগলেন, যা নোভাস্কোটিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পযন্ত প্রতিটি ছোট কুটিরে বারেবারে উচ্চারিত হচ্ছিল তখন শ্রোতারা কেউ তেমন গা করেনি, কারুর তেমন আগ্রহ হয় নি।

কিন্তু যখন বিবেকানন্দ বলতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা দেখলেন যে এক নেপোলিয়নের মুখোমুখী হতে হবে তাঁদের। তাঁর (স্বামীজীর) প্রথম বক্তৃতা যেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। প্রতিটি শব্দ অতি আগ্রহের সঙ্গে লিখে নিলেন সাংবাদিক-সঙ্কেতলিপিকারের দল। তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়ে আর তা প্রকাশিত হলো হাজার হাজার সংবাদ পত্রে। বিবেকানন্দ হয়েছিলেন দিনের নর-কেশরী। ক্রমে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে গেল। যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিতেন সেই সব হল

শ্রোতার ভিড় সামলাতে পারতো না। এরা (আমেরিকাবাসী) বছরের পর বছর ধরে বাজে মেয়েদের ও অর্দ্ধশিক্ষিত নির্বোধ পুরুষদের লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে পাঠিয়েছে এশিয়ার দরিদ্র, হতভাগ্য পাপীদের উদ্ধার করবার জন্য, আজ সেই নিরুদ্ধারিত মানব সম্প্রদায়ের একজন এখানে এসেছেন যিনি এই সমগ্র দেশের সমস্ত মানুষ ও মিশনারীদের চেয়ে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অনেক বেশি জানেন। এই প্রথম তারা ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা শুনল। এসব তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাঁর (স্বামীজীর) বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই অসম্ভব। তিনি মানুষগুলিকে নিয়ে এমন ভাবে খেলা করতে আরম্ভ করলেন যেমন বেড়াল ইঁদুরকে নিয়ে খেলে। তারা নির্বাক। তারা কি-ই বা করতে পারে? তাদের কি করবারই বা আছে? তারা (মিসনারী) সবসময় যা করে থাকে তাই করলো—তারা তাঁকে (বিবেকানন্দকে) শয়তানের দূত বলে অপপ্রচার করতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ। তিনি (স্বামীজী) বীজ বপন ক'রে ফেলেছেন এবং আমেরিকাবাসীরা ততক্ষণে ভাবতে সুরু করেছেন। তাঁরা (আমেরিকাবাসী) নিজেরা বলাবলি করতে লাগলেন —

> 'আমরা কি মিশনারিদের পাঠিয়ে টাকা নষ্ট করবো—যারা এই মানুষটির (বিবেকানন্দ) তুলনায় ধর্ম বিষয়ে কিছুই জানে না আর তাঁরই মত মানুষদের ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান দিতে যাবে?' 'না!' এর ফলে স্বভাবতঃই মিশনারীদের আয় বছরে এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক'মে গেল। *

এই কথাগুলি থেকে স্বামীজীর প্রতি ম্যাকসিমের মনোভাব টের পাওয়া যায়। স্বামীজীও ম্যাকসিম সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—[২]

* ম্যাকসিমের বক্তব্যের ভাবানুবাদ —লেখক কৃত।

২. পরিব্রাজক।

'প্যারিস নগরী হতে বন্ধুবর ম্যাকসিম নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা যায়। ম্যাকসিম—বিখ্যাত 'ম্যাকসিম গানের নির্মাতা, —যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে —আপনি ঠাঁসে, আপনি ছোঁড়ে—বিরাম নাই। ম্যাকসিম আদতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি—। ম্যাকসিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি আর কিছুই করিনি ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া ?' ম্যাকসিম চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই-পত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ।'

নিকোলা টেসলা

ইতিপূর্বে এক অধ্যায়ে বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী নিকোলা টেস্‌লার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানী প্রবর টেস্‌লার সঙ্গে তাঁর চিন্তার আদান প্রদান হতো এমন কথা জানা যায়। টেস্‌লা স্বামীজী সম্বন্ধে কি লিখেছেন বা মন্তব্য করেছেন তা জানা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। তবে স্বামীজীর এক পত্রে টেস্‌লা প্রসঙ্গ আছে। নিউইয়র্কে থাকাকালীন স্বামীজী সারা বার্নহার্ড অভিনীত 'বুদ্ধ জীবনী' দেখতে গিয়েছিলেন।

দর্শকদের মধ্যে স্বামীজীকে দেখে সারা বার্নহার্ড নিজেই তাঁর সঙ্গে আলাপের জন্য আগ্রহী হন। স্বামীজীর পরিচিত কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে তিনি ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং 'শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক' নিকোলা টেস্‌লা ছিলেন। এই সাক্ষাতের বিষয়টি স্বামীজী ই. টি. স্টার্ডিকে লিখে জানান।

'মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। এম্. মোরেল ঔৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক 'প্রাণ' ও 'আকাশ' এবং 'কল্পের' তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। 'আকাশ' ও 'প্রাণ' আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহের এই নূতন গণিত মূলক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

তা যদি প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টি-বিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এখন বেদান্তের সৃষ্টি-বিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি, এদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি।* তার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সৃষ্টি-বিজ্ঞান। তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে।' [৩]

এই চিঠি থেকে স্বামীজীর সম্বন্ধে টেস্‌লার মনোভাব বোঝা যায় এবং তাঁর উপরও বিজ্ঞানী প্রবরের প্রভাব যে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামীজী-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস

* এ ভাবে তিনি বই লিখে যেতে পারেননি—লেখক।

৩. পত্রাবলী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬।

দিয়েছেন। তিনি যখন লণ্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তখন স্বামীজী একদিন তাঁর প্রচার সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের মনোভাব কেমন তা জিজ্ঞাসা করেন তাঁর অনুগত ভক্ত মিঃ গুডউইনকে। মহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়—[৪]

> 'স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে কে কে সহায় হবে?—টেস্‌লা ও এডিসনের কি ভাব? গুডউইন বলিলেন, টেস্‌লা সপক্ষ হবে, কিন্তু এডিসনের সহিত আদায়-কাঁচকলায়।'

লর্ড কেলভিন ও অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের পরে স্বামী বিবেকানন্দ তড়িৎ যন্ত্রের উদ্ভাবক বিখ্যাত প্রফেসর 'এলাইশা গ্রে'র 'হাইল্যাণ্ড পার্ক' নামে সুদর্শন ভবনে এক জনসভায় আমন্ত্রিত হন। স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন হয়। এখানে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। তখন সেখানে 'ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেস' এর অধিবেশন হয়েছিল। ফলে বিশ্বের নানা স্থান থেকে আগত বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে আলাপিত হওয়ার সুযোগ এসে গিয়েছিল। বিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী সার উইলিয়ম টমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন নামে বিখ্যাত হন), অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোলৎস, অ্যারিটন হপিট্যালিয়া প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা স্বামীজীর তড়িৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়ে ছিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় তাঁর চমৎকার উত্তর প্রত্যুত্তর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

৪। মহেন্দ্রনাথ দত্ত : লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম)

বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্র-নিবেদিতা

দু'দিকের দুই দিকপাল—সন্ন্যাসী ও বিজ্ঞানী। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও বিজ্ঞানকে ভালবাসতেন একান্তভাবে। এই ভালবাসা তাঁকে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। একদা তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বিদেশী শাসকের প্রবল বাধা অতিক্রম ক'রে বিদেশে পরাধীন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। স্বদেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ-কারী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এটিও তার এক কারণ। বিজ্ঞানীর প্রতি তাঁর প্রীতি আমৃত্যু বজায় ছিল। প্যারিস প্রদর্শনীর পরে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপের সুযোগ ঘটেছিল কিনা তার বিবরণ জানা যায় নি তবে দু'জনেই দু'জনের কর্মধারা লক্ষ্য রাখতেন তার প্রমাণ আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের উদার মতবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রশংসায় অবিচল ভাব জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষ এবং বিদেশে স্বামীজীর কার্যকলাপ পত্র-পত্রিকার মারফৎ অবহিত হয়ে তিনি বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ।

নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বামীজী নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন এবং কোন গ্রন্থকার বলেছেন গুরু নিজেই শিষ্যাকে বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত করান। এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানা যায়নি।

১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে লেখা নিবেদিতার এক চিঠি থেকে স্বামীজী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—

'তারপর তিনি (জগদীশচন্দ্র) বললেন, কী সে অপূর্ব আনন্দ শিহরণ, যখন তিনি শুনলেন, স্বামীজী বলছেন, দেশের মানুষের মধ্যে পৌরুষ সৃষ্টিই তাঁর জীবনব্রত। সেই একই শিহরণের সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে স্বামীজীর কলকাতার বক্তৃতা পড়লেন ও দেখলেন যথার্থ সত্যের জন্য, মানুষের জন্য, হেলায় স্বামীজী তাঁর জনপ্রিয়তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন……'

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে যে দু'জন মহীয়সী মহিলার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চার্য—তাঁরা হলেন ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমতী ওলিবুল। স্বামীজীর মৃত্যুর পরে এঁদের কাছে জগদীশচন্দ্রের লেখা দুখানা চিঠিতে তাঁর প্রতি বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধা গভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্র লিখলেন[৫]—

'কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কি ক'রে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কি ভাবে এখন সব কিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই।

আমি এখনও যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দুবছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা—তাঁর মধ্যে সব কিছুই বিরাট, সন্দেহ নেই।

কী বিপুল বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। এই বিষাদকে যেন অতিক্রম করিতে

৫. বিশ্ববিবেক: অসিত বন্দ্যোঃ, শঙ্করী প্রসাদ ও শঙ্কর সম্পাঃ

পারি। ভারতে যারা বেদনার্ত, আমাদের ভাবনা যাচ্ছে তাদেরই কাছে।'

[লণ্ডন, ৯ই জুলাই, ১৯০২]

এই পত্র কোন শোকগ্রস্ত মহিলাকে সান্ত্বনাদানের জন্য নয়, আচার্য জগদীশচন্দ্র অন্তরে যা উপলব্ধি করেছেন তারই বহিঃ-প্রকাশ এই চিঠি। শ্রীমতী বুলকেও তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্বামীজীর অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা বলা হয়েছে। যে বিরাট কাজ স্বামীজী সমাধা করে গেছেন এবং যা অসমাপ্ত রেখে গেছেন তার পরিমাপ করা কি আমাদের সাধ্য—এ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি সেই পত্রে। জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন বিবেকানন্দের কীর্তি, তাঁর শিক্ষা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষকে করে তুলবে শক্তিমান। চিঠিখানা পড়লে সহজেই অনুভব করা যায় স্বামীজীর অকাল প্রয়াণে জগদীশচন্দ্র কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন।

'হারিয়ে যায় না কিছুই। যে সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎস ভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহামুহূর্তের প্রতিধ্বনি—কালের মধ্যে যে প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়। সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে, পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কার্য যথার্থত কি তা অনুভব করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একজন মানুষ একলা কি ক'রে ঐ সকল কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল, কিন্তু তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে, তাঁকে জাগিয়ে তুলবে, আর শক্তি দেবে।'

প্যারিসে দুই যুগন্ধর পুরুষের সাক্ষাৎ হবার আগে কবে তাঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়নি। আগেই বলা হয়েছে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। বিজ্ঞানীর প্রতি তিনি যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ মিলবে এই চিঠিতে[৬]—

'আজ ২৩শে অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী

৬. পরিব্রাজক।

যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—
বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!'

জগদীশচন্দ্রের জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন এদেশে কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এমন অবস্থা অনেক সময় হয়েছে যে, তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এদেশ ছেড়ে যেতেও প্রয়াসী। তাঁর মানসিক দোলায়মান অবস্থার কথা স্বামীজীর অনুগতা মিস মেরী হেল জানতেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ভারতের বিশেষতঃ বাঙলা দেশের হিন্দুরা জগদীশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করেছে নানা কারণে। কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। এ সম্বন্ধে স্বামীজী মিস্ হেলকে লস্ এঞ্জেলস্ থেকে ১৯০০ সালের ১৭ জুন তারিখে এক পত্রে লেখেন[৭]—

'তুমি যদি মনে করে থাক যে, হিন্দুরা 'বসু'দের পরিত্যাগ করেছে, তা হ'লে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য ক'রে তুলেছে, সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।'

মিসেস ওলি বুলের (ধীরামাতা) সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। বিশেষতঃ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনায় নানাভাবে তিনি সাহায্য করেছেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর মারফত স্বামী বিবেকানন্দকে 'নাসদীয় সূক্ত' অনুবাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে স্বামীজী ধীরামাতাকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশিত। ১৯০১ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে মায়াবতী থেকে স্বামীজী লেখেন[৮]—

৭. পত্রাবলী
৮. পত্রাবলী

'ডাক্তার বসু আপনার মারফৎ যে 'নাসদীয় সূক্ত' পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। আমি অনুবাদটিকে যতটা সম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, ডাক্তার বসু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।'
ঐ বছরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তাঁকে লেখা আর এক পত্রেও স্বামীজী একই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, 'আশা করি, ডক্টর বসু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।' তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে আরো এমন অংশ আছে যার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। এই শ্রদ্ধা তাঁর আতান্তিক বিজ্ঞান-প্রীতির জন্যও বটে।

এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চার্য আরো একটি নাম—নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করেছেন। একথা বলা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যে, নিবেদিতা তাঁর চিন্তায় অনেক নতুনত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন। যে বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান-চর্চা, অল্প সময়ের পরিসরে সম্যকভাবে স্বামীজীর মধ্যে মুকুলিত হতে পারেনি, নিবেদিতার মধ্যে তারই প্রকাশ দেখা গেল। মানস-কন্যার লেখনীর মধ্যে গুরু বিবেকানন্দের চিত্র উদ্ঘাটিত হ'ল।

বিজ্ঞানের প্রতি ভগিনীর আত্যন্তিক অনুরাগের স্বাক্ষর ভারত বিশেষতঃ বাংলাদেশের অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সায়েন্স কলেজের বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাগারে ভারতাত্মজা নিবেদিতাকে দিনের পর দিন যেতে দেখা গেছে এবং নানাভাবে বিজ্ঞানী ও তরুণ গবেষকদের তিনি উদ্বোধিত করেছেন।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় হয় স্বামীজীর উৎসাহে। বলা যেতে পারে জগদীশচন্দ্রের প্রচণ্ড হোমসাধনায়

ছবি সংগ্রহকারী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র যদি হন এক বিরাট ল্যাবরেটরী, তাহলে নিবেদিতা সেই গবেষণাগারের বিদ্যুৎশক্তি—যে শক্তিবলে কর্মে উদ্দীপনা আসে, যে শক্তি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে গবেষককে দেয় নতুন উৎসাহের আলো, যে শক্তির প্রভা হতাশার নিঃসীম অন্ধকারে বিজলীর চমক দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে নতুন পথের সন্ধানে ঠেলে দেয়।

ডায়নামিক শক্তির আধার নিবেদিতা আর সাধনায় অক্লান্ত বীর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। স্নেহময়ী সহোদরা ও স্নেহধন্য সহোদর। ১৭নং বোসপাড়া লেন থেকে ৯২।৩ আপার সার্কুলার রোড (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)।

তখনকার নবীন ভারতের এই দীপ্ত আলোক-শিখারূপী জগদীশচন্দ্র সহজেই নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে বলে জানা গেছে। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> 'তাঁর (জগদীশচন্দ্রের) কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'

জগদীশচন্দ্র নিজেই এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন ঃ

'শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় লইতাম।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন প্রচার করেন বিবেকানন্দ, তেমনি জগদীশচন্দ্রের প্রচারের মূলে ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর সাহায্য না পেলে জগদীশচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হ'ত কিনা সন্দেহ। জগদীশচন্দ্রও এই মহাসত্য চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর ছ'বছর পরে ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্য

বসু সর্বপ্রথম নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে বলেছিলেন,

> 'আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি ; এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে কত উৎসাহ ছিল, তাহা একমাত্র আমিই জানি।'

ক'লকাতায় এসে এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মিশে নিবেদিতা দেখলেন যে, এত খ্যাতিমান, তবু খ্যাতির প্রতি লোভ নেই—ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বল্পভাষী ও সত্যান্বেষী এই মানুষটিকে প্রথম দিন থেকেই ভাল লেগে গেল নিবেদিতার।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন একাকী অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন—তখন একমাত্র নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিবারে, নিজের পরিবেশে জগদীশচন্দ্র ছিলেন একা। নিরুৎসাহ, ভগ্নোদ্যম অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে জগদীশচন্দ্র বীতশ্রদ্ধ জীবনের প্রতি। সেই সঙ্কটকালে নিবেদিতার সাহচর্য তাঁকে নতুন আলোকের সন্ধান দিল।

জগদীশচন্দ্রের অপরিমিত সৃজনীশক্তি আছে একথা নিবেদিতা বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই তিনি আপ্রাণ সাহায্য করেছেন জগদীশচন্দ্রকে জগৎ-সভায় জয়মাল্য লাভ করতে।

নিবেদিতার মধ্যে এক তেজস্বিনী আত্মাশক্তি বিরাজমান, এই শক্তি জগদীশচন্দ্রের অবসন্নতাকে দূর ক'রে দিতে পারে—তারই জন্য বোধহয় জগদীশচন্দ্র ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। সময়ের খেয়াল থাকত না।

আচার্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির পাণ্ডুলিপি নিবেদিতা নিজে লিখে তাঁকে সাহায্য করেছেন। জগদীশচন্দ্রের 'Plant Response'

বইখানিতে নিবেদিতার স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে ভারতের সংবাদপত্রে আলোচনা করার বন্দোবস্ত নিবেদিতাই ক'রে দেন।

একদিনের ঘটনা। নিজের বাড়ীতে গবেষণাকক্ষে বসে জগদীশচন্দ্র নিবিষ্ট মনে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় তিনি পার্থিব জ্ঞানশূন্য। এমন মুহূর্তে নিবেদিতা হাজির। জগদীশচন্দ্র বললেন,

> 'জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে তা আমি দেখেছি। কোন ভুল নেই, জড়ও চৈতন্যময়।...এমনকি ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তার নাগাল পাবই। আগে গাছপালায়, পরে পাথরে যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করবই। আছে, আমি জানি।'

এমনি দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাতে নিবেদিতা বিস্মিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপর ঝুঁকে কি বুঝলেন নিজেই জানেন। বললেন, 'আমাকে যে কথা বললেন তা আপনার লিখে ফেলা উচিত।'

জগদীশচন্দ্র বললেন, 'সে কল্পনাকে কেমনভাবে রূপ দেব ?'

সহোদরা যেন সহোদরকে গভীর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি তো আছি।' সত্যিই তাই। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করে গেছেন।

পার্বত্যতীর্থ ভ্রমণে যাবার ইচ্ছে নিবেদিতার। হিমালয়ের সুমহান গাম্ভীর্য তাঁকে দুর্নিবার আকর্ষণ করল। সঙ্গী কোথায় ? গুরুর বিচ্ছেদ আবার তীব্রভাবে অনুভব করলেন নিবেদিতা। মনে পড়ল আমৃত্যু-সুহৃদ বসু-দম্পতির কথা। জানালেন তাঁদের কাছে তাঁর ইচ্ছা। সানন্দে রাজী হলেন বসু-দম্পতি। গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবেদিতাকে নিয়ে কেদার-বদরী যাত্রা করলেন।

শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন নিবেদিতাকে, 'এই দুর্গম পথের তীর্থদর্শনে আপনার এত আগ্রহ কেন ?' স্নিগ্ধ সুন্দর হাসি হেসে বলেছিলেন নিবেদিতা ঃ

গুরুর মুখে শুনেছি যে, হিমালয়ের মধ্যে হিন্দুদের যে ক'টি তীর্থস্থান আছে, কেদারনাথ ও বদরীনাথ তাদের মধ্যে প্রধান ও প্রাচীন। কত যুগ ধরে এই দুটি তীর্থ আপন মহিমায় বিরাজিত। মহাভারতে পড়েছি পাণ্ডবেরা এই পথ দিয়েই মহাপ্রস্থানে গিয়েছিলেন। গুরু বলতেন, প্রত্যেক ভারত-বাসীর কাছে এ পথের ধূলিকণা চির পবিত্র। এ কি না দেখে থাকতে পারি?'

শ্রদ্ধায় নত হয়েছিলেন সেদিন বসু দম্পতি।

নিবেদিতার জীবনের শেষ বছর। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র এসে বললেন তাঁকে, 'আপনাব শরীর তো সারছে না। আমাদেব সঙ্গে দার্জিলিং-এ চলুন। অনেক কাজ করেছেন, এবার একটু বিশ্রাম নিন।'

নিবেদিতা বললেন, 'আপনারা আগে যান, আমি পবে আসছি।'

১৯১১ সালের অক্টোবব মাস। দার্জিলিং-এ এসেই নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রক্ত আমাশয়। ডাঃ নীলরতন সরকার জগদীশচন্দ্রের 'ডাক' পেয়ে গেলেন। ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারও এলেন জগদীশচন্দ্রেব কাছ থেকে ডাক পেয়ে। স্যার নীলরতনের মুখ গম্ভীর দেখেই জগদীশচন্দ্র বুঝলেন 'জীবনের আশা নেই'। বসু-পত্নী সারাদিন সর্বক্ষণ ভগিনীর রোগশয্যাপাশে বসে শুশ্রূষা করতেন। শোকবিহ্বলা অবলা বসু বলেছেন, 'কিছুদিন আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগশয্যাপার্শ্বে থেকে শুশ্রূষা করেছিলেন, আজ আমার পালা...'

জগদীশচন্দ্রের জীবনে নিবেদিতা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রেব বাসকক্ষ ও বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাচীর ও ছাদে নানাবিধ চিত্র নিবেদিতার নির্দেশানুসারে আঁকা হয়েছিল। নন্দলাল বসু

নিজে এই ছবি এঁকেছিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছেতেই জগদীশচন্দ্রের ঘরের দেয়ালে ভারতমাতার ছবি আঁকা হয়।

নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি জগদীশচন্দ্র। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে জগদীশচন্দ্র একটি ব্লক নির্মাণ করেন এবং তার পরিচালনার জন্য 'নিবেদিতা ট্রাষ্ট' গঠন করে একলক্ষ টাকা দিয়ে যান।

জগদীশচন্দ্র , অবলা বসু, রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার প্রমুখদের সঙ্গে বুদ্ধ গয়াতে গিয়ে নিবেদিতা এক বজ্রখোদিত প্রস্তরখণ্ড দেখতে পান। প্রবাদ আছে ঐ বজ্র নাকি স্বয়ং ইন্দ্রদেব বুদ্ধদেবকে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বললেন, 'একে ভারতের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা উচিত'। অর্থ জিজ্ঞেস করাতে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'যখন কোন মানুষ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হন এবং দেবনির্দিষ্ট কার্য সমাধা করেন।'

নিবেদিতার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ আচার্য বসু বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষদেশে নিবেদিতার আবিষ্কৃত ইন্দ্রের বজ্র-চিহ্ন স্থাপন করেছেন।

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারপথে প্রদীপ হাতে নারীমূর্তি চিরদিন নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

বছরের পর বছর বহু বিজ্ঞান-সাধক আসবে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিজ্ঞানশালায়। প্রবেশের পথে থমকে দাঁড়িয়ে দেখবে ঐ নারীমূর্তি আর হয়ত অন্তরে অনুভব করবে ঐ প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখা—যে শিখা একদিন মন্দির প্রতিষ্ঠাতার জীবনকে আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল।

বিঃ দ্রঃ—জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার প্রসঙ্গ লেখকের পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধঃ 'জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা' (যুগান্তর, ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৮) থেকে সংযোজিত।

ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এবং টেকনিক্যাল এড়ুকেশন বা কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকেও অনেক সময় বেশী বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক সার পেট্রিক গেডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পরে নিবেদিতা বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর এই আকর্ষণ যে মুহূর্তের ছিল না তার প্রমাণ তাঁর জীবনের দিনগুলির ইতিহাস।

ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর এক মূল্যবান গ্রন্থে[১] ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভারতের কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বিদেশে ঐ উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা চালু আছে তার সম্বন্ধে বিস্তৃত নিরীক্ষা করেছেন। ঐ গ্রন্থের 'Manual Training in Education' অধ্যায়ে কারিগরি শিক্ষার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা যেন স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রতিধ্বনি—

> 'Technical Education has the advantage of offering a handsome livelihood to the man who has been so fortunate as to secure it.'

তৎকালীন দেশীয় রাজ্যসমূহ সেতু নির্মাণ, রাস্তা তৈরী, বন-সংরক্ষণ, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে যাতে হাত দিতে পারে সে বিষয়েও তিনি অনেক প্রস্তাব রেখেছেন।

বিদ্যালয় থেকেই ছাত্রদের কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত করান যায় কিভাবে সে বিষয়ে তাঁর মতামত ও পরিকল্পনা ভেবে দেখার মত।

---

১. Hints on National Education.

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী

আজ পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কক্ষপথে অবস্থান ক'রেও একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনে কি না। এ প্রশ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তারপরে পর পর কতকগুলি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হবার পরে বিশেষ ক'রে জেগেছে। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যতটা অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যেও প্রচুর রহস্য রয়ে গেছে যার সমাধান হয়নি। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ অথবা যন্ত্রের সাহায্যে যে জগৎ আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে তার কথা আমরা জানতে পারি। আমাদের অনুভূতি শক্তি নিঃসন্দেহে অল্প, তবুও এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত এক জগতের সন্ধান যেন দেয়। বিশ্বের যে অংশটুকু (অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ) আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, আমরা তার কথাটিই জানি।

আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞানের এক ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর জন্যে অনেকে বিজ্ঞানকে দায়ী করেন। কিন্তু তা ভুল। যেহেতু মানুষের লোভ যখন হিংস্র হ'য়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে চালিত করে বিপথে। তার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে নামে ধ্বংসের অশুভ ছায়া। কিন্তু এইটেই বিজ্ঞানের একমাত্র রূপ নয়। তার কল্যাণকামী রূপ পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছে স্বস্তি, দিয়েছে সুখ, এনেছে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ।

তাই বলে মানুষ শান্তি পেয়েছে? অনেকে বিরাট অট্টালিকা তৈরী ক'রে নাম দেন 'শান্তি কুঞ্জ'। কিন্তু অভ্যন্তরের বাসিন্দারা কি শান্তি পেয়েছেন? এ প্রশ্ন জটিল। যন্ত্র সভ্যতার বর্তমান

স্তরে দাঁড়িয়ে আমরা কি অনুভব করতে পারছি না যে, বিজ্ঞান তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর আমরা লোভের তাড়নায়, স্বার্থান্ধ হ'য়ে যান্ত্রিক শক্তিকে মানুষের ধ্বংসে নিয়োজিত করছি। যন্ত্র এনেছে সুখ, বিলাস, আরাম, কিন্তু সমাজ থেকে কি নিষ্পেষণ, অত্যাচার চলে গেছে? বিলাসের পঙ্কে মাথা ডুবিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছে। মদ্যাসক্তি, আত্মহত্যা, সন্দেহ প্রবণতা এবং আরো হাজারো অন্যায় কি প্রতিনিয়ত আমাদের স্পর্শ করছে না? কেন? এর একটি মাত্র উত্তর হতে পারে—মানুষ অন্তরে সুখী নয়। যদি কেউ বলেন ধনবৈষম্য হওয়ার জন্য সমাজে নানা ব্যাভিচার চলছে, শুধু যদি তাই হবে, তাহলে যারা অর্থশালী তারা অতৃপ্ত কেন? বর্তমান সভ্যতা আমাদের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না বলেই বিক্ষোভ, অশান্তি। অর্থাৎ নিজের মনকে বশে রাখার মন্ত্র গেছি ভুলে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা অন্য দৃষ্টিতে এই সমস্যাকে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন—

> 'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
> তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি'
>
> (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০)

—মানুষ (তার প্রয়োগবিদ্যার সাহায্যে—লেখক) যদি সমগ্র আকাশকে একখণ্ড চামড়ার মত গুটিয়ে ফেলতে পারে [অর্থাৎ মানুষ যদি এত শক্তিশালী হয়; বিজ্ঞানের সাহায্যে (?)—লেখক] তাহলেও তাদের দুঃখের অবসান হবে না। যেহেতু অন্তরের প্রজ্বলন্ত সেই পরম সত্তাটিকে না চিনলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না।*

---

* স্বামী রঙ্গনাথানন্দ কৃত ইংরেজী ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ—লেখক।

প্রায় একশ বছর আগে দার্শনিক শোপেনহাউয়ার বলে গেছেন [১],

> 'All men who are secure from want and care, now that at last they have thrown off all other burdens, become a burden to themselves.'

কথাটা দুঃখের, কিন্তু রূঢ় বাস্তব। আজ মানুষ নিজেই নিজের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আরো আবিষ্কার, প্রয়োগ বিজ্ঞানের আরও উন্নতি কি মানুষের সব সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে? কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী বলবেন, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে কোন যুদ্ধ, কোন বিপ্লব, অশান্তি ইত্যাদি থাকবে না। বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে বলতে চাই একই মতে বিশ্বাসী বা একই সমাজ-ক্রমে আস্থাশীল রাষ্ট্রসমূহ কি প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধুস্থানীয়? এ প্রশ্ন রাজনীতিকের বা কূট সমাজবিজ্ঞানীর। বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভেদ, মানুষে মানুষে বৈষম্য। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি অমীমাংসিত সমস্যা ও অদমিত বা অপ্রশমিত অশান্তি।

কথা উঠবে, তাহলে কোন্ পথে শান্তি আসবে! এই নিয়ে বিশ্বের নানা পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন মানুষ যদি ধর্মবিজ্ঞান অনুশীলনে (স্বামীজী ধর্মকে বিজ্ঞান বলেছেন) নিষ্ঠাসহকারে আগ্রহী হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। ধর্মবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথে চললে শক্তি আসে, বিবেক আসে, সমবেদনা মানবতা, প্রতি জীবে প্রেম প্রভৃতি মানবিক সৎ-গুণ স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে মানুষের অন্তরে। অন্যায় থেকে বিরত

১। Schopenhauer : The world as Will and Idea, Vol 1. p. 404.

হওয়ার প্রেরণা, লোভ দমন করবার প্রবৃত্তি মানুষকে মহত্তর লোকে নিয়ে যায়। দার্শনিক-বিজ্ঞানী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথায় 'খ্রীষ্টীয় প্রেম'[২] (Christian love) সামান্য মাত্রায় জাগরিত হলেও আমরা ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারি। এই 'খ্রীষ্টীয় প্রেম' অর্থাৎ প্রতিবেশীকে ভালবাসা, তা সঞ্জাত হয় ধর্মবিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে। স্বামীজী বলেছেন, মানুষের মধ্যে যা সৎপ্রবৃত্তি আছে তাকে জাগিয়ে তোলার কাজ হচ্ছে ধর্মের। তিনি বলেন,

'যাঁর হৃদয় দরিদ্রের জন্য কাঁদে, তাঁকেই মহাত্মা বলি, তা না হলে তিনি দুরাত্মা।'

স্বামীবিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন এই হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত কাজ। ধর্ম-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলে। অন্য কোন বিজ্ঞান মানুষকে এমনিভাবে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে না। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'সত্যিই কি ধর্ম বিশেষ কিছু করতে পারে ?' বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, [৩]

> 'হাঁ, পারে। এতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যা, তা এই ধর্মের শক্তিতেই হয়েছে। আর তা-ই এই মানুষ নামে প্রাণীকে দেবতা করবে। ধর্ম তা করতে সমর্থ। মানব সমাজ থেকে ধর্মকে বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে ? (সংসার) শ্বাপদসঙ্কুল বন ছাড়া আর কিছুই হবে না। ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'জ্ঞান'। আমরা দেখতে পাই, পশুরা

---

২. Bertrand Russel : Impact of Science on Society, p 114.

৩. Swami Vivekananda : Complete Works. Vol III, p 4, 8th Edn.

[লেখক কর্তৃক অনূদিত]

ইন্দ্রিয় সুখে যতটা প্রীতি লাভ করে, মানুষ তার বুদ্ধি শক্তি চালনা ক'রে তার চেয়ে বেশি সুখ অনুভব করে। আর আমরা এ-ও দেখতে পাই, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির পরিচালনার চেয়ে আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ বেশি সুখী হয়। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলতে হবে। এই জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসবে।'

বিজ্ঞান ও ধর্মেব নানা সংজ্ঞা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ধর্মেব অবিরোধী। উভয়ের লক্ষ্য মূলতঃ এক। মানুষের মন উন্নত করা, অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করা যাতে প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পাবে। ধর্ম এবং বিজ্ঞান উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সভ্যতা ধর্মানুশাসনে রচিত। তার ফলে ব্যবস্থার ফলাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। বর্তমান সভ্যতা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এরও ফল আংশিক এবং সীমিত।

কাজেই চাই উভয় বিজ্ঞানের মিলন। বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞান—মাঝখানে যদি আধ্যাত্মিক শক্তির সেতু থাকে তাহলে যে মানুষ সৃষ্টি হবে তা আদর্শ-পুরুষ। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। তারই জন্য পৃথিবী অপেক্ষমান। স্বামীজী এই কথাটাই বলে গেছেন। ধর্মের উদ্দেশ্য কি? তাঁর ভাষায়—[৪]

> 'The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal.'
> 'Do this either by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free.'

---

৪. Swami Vivekananda : Complete Works, Vol. 1. p 124 11th Edn.

'This is the whole of religion. Doctrines, or dogmas, or rituals or books or temples, or forms, are but secondary details.'

[বাইরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে (বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি) বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের সাহায্যে নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই হচ্ছে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ।

মতবাদ, অনুষ্ঠান, আচার, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ এর গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র—অনূদিত]

স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করেছেন তা বিজ্ঞান ও ধর্মের সুসমঞ্জস মিলন। তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সার্থক সম্মিলন।

*বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলার প্রবণতার সময়ে বেদান্ত তার যথার্থ স্থান লাভ করবে। কারণ বেদান্ত বলছে এই উভয় বিদ্যা পরস্পরের অনুপূরক।

বিবেকানন্দ এই কথাই বলে গেছেন। এবং তিনি নিজে কি ছিলেন? মনীষী রোঁমা রোঁলার কথায়[৫]

'In the two words equilibrium and synthesis, Vivekananda's constructive genius may be summed up. He embraced all the paths of spirit: the four Yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action, from the most spiritual

to the most practical. ...He was the personification of the harmony of all human energy'.

(ভারসাম্য ও সমন্বয়—এই দু'টি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক থেকে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সব কাজ—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।)

মস্তিষ্ক ও হৃদয়—উভয়ের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দের অন্যতম প্রয়াস। তা যদি না হয় তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের মুখে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল, উ. থাণ্ট এ সম্বন্ধে বলেছেন[৭],

> 'স্বামী বিবেকানন্দ, প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তুবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাহার সহিত প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে কার্যকর না করা হয়, যদি নিছক মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটাইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গে একইভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটান না হয়, তাহা হইলে আমরা অনিবার্যভাবে এক সঙ্কট হইতে অন্য সঙ্কটের দিকে আগাইয়া যাইব'। (২৮.৩. ১৯৬৩)

মানুষ কি গ্রহণ করবে—ভবিষ্যতে কোন ধর্ম থাকা উচিত এসম্বন্ধে বিবেকানন্দ দূরদ্রষ্টার মত বলে গেছেন ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে 'The Absolute and Manifestation' বক্তৃতায়। সেখানে তিনি বলেছেন—[৮]

---

৬. বিশ্ববিবেক, পৃ ১৯৫।

৭. Swami Vivekananda : Complete Works, Vol. II, p. 140, 10th Edn.

'বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা। তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে প্রচার করলেন। অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন শঙ্করাচার্য তাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করলেন। আমরা এখন চাই, এই প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হোক। এই সম্মিলন আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনের সন্ধান দেবে। (তাহলে) বিজ্ঞান ও ধর্ম একত্রে মিলিত হবে ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে (ইংরেজীতে 'hand shake' কথা আছে।. বাংলায় তার প্রতিশব্দ করমর্দন। যেহেতু ভারতীয় প্রথায় করমর্দনের চাইতে আলিঙ্গন প্রথা চালু, সেই হেতু অনুবাদে 'আলিঙ্গন' শব্দ ব্যবহৃত হ'ল—লেখক) এটিই হবে ভবিষ্যতের ধর্ম। আর যদি আমরা তাকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, তা সর্বকালের ও সর্বাবস্থার উপযোগী হবে।'

বিবেকানন্দ ধর্মকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ক'রে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় শাস্ত্র প্রবক্তারা যা বলে গেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, একথা স্বামীজী শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে গেছেন।

তাঁর বেঁচে থাকাকালীন সময়ে জড় বিজ্ঞানের যেসব ত্রুটি ছিল তিনি সেসব দেখিয়ে ধর্মবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় জ্ঞান প্রাচীন ভারতে জ্ঞাত ছিল একথা অনেকে বলেন। তা যে সত্য নয় তাতে দ্বিমত নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, একসময় ভারত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্যোতির্লোকে বিচরণ করেছে। তখন ইয়োরোপ (রোম, গ্রীস বাদে) তমসাচ্ছন্ন। প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিরা যে বিজ্ঞান-চিন্তার

প্রকাশ দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তখন সমগ্র পাশ্চাত্য অজ্ঞানতার সুষুপ্তিতে মগ্ন। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দকে তাই অধিকাংশ সময় প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কথা বলতে শোনা গেছে। তাই বলে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করেছেন তা মোটেই নয়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (যেমন ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব) ত্রুটি দেখিয়ে বলেছেন যে, প্রাচীন ঋষিরা এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অধিকতর বৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিবৃত্তকে কতটা প্রাধান্য দিয়েছিলেন জানা নেই। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। তার হয়ত একটা কারণ আছে। এক সময়ে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। যদিও গ্রীস ও রোমে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস প্রাচীন। ইয়োরোপে বিজ্ঞানচর্চার সুরু হবার পর থেকে তা একেবারে নীরব হয়ে যায়নি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন ভারতে (বেদ ও বেদোত্তর যুগে) বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে স্বীকার করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'History of Chemistry in Ancient and Medieval India', 'Chemical Knowledge of the Hindus' প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতে রসায়নচর্চার ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত। আচার্য শীলের 'The Positive Sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থে বেদ ও বেদোত্তর যুগের বিজ্ঞানচিন্তার সামগ্রিক চিত্র ধরা আছে। অন্যান্য লেখকদের (দেশী ও বিদেশী) রচিত নানা গ্রন্থেও হিন্দু এবং ভারতীয় মনীষীদের বিজ্ঞান অনুশীলন ও চিন্তার বিস্ময়কর আধুনিকতা দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই বৈজ্ঞানিক মেজাজের

অধিকারী। তাহলেও তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য আছে এবং তা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ কবি। হয়ত একারণেই স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষাকৃত বেশী বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচর্চাকে অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু তার প্রয়োগ বা প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রথম দিকে সমর্থন জানাতে পারেননি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এক গ্রন্থে[৮] আছে।

বিবেকানন্দ জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কল, কারখানা, চাই। শিল্পসংস্থা গড়ে উঠুক, মানুষ স্বাধীনভাবে যাতে নিজের রুটি সংগ্রহ করতে পারে তার কথাই বলেছেন তিনি। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন (তখন দেশে অভাব অনেক কম) শিল্পের প্রসার না হলে অন্ন সমস্যা, বেকার সমস্যা প্রভৃতির সমাধান হবে না। তাই কারিগরি বিদ্যা অনুশীলনের জন্য, যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসারের জন্য তাঁর উৎসাহ ছিল আত্যন্তিক। এক ধর্মসঙ্ঘের মধ্যমণি হয়েও তিনি বিরোধিতা করেছেন তথাকথিত পূজা-অর্চনার।

ধ্যানমার্গে যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা অনেকেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করেন। একথা সত্য যে, অনেকে জ্ঞানাতীত অবস্থায় এসে পড়েন। অনেকে হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ ক'রে তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিশে থাকে কুসংস্কার। জ্ঞানাতীত মার্গে পৌঁছাতে হলেও প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অধ্যয়নের। একথা স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন। তা না হলে লব্ধজ্ঞান প্রকৃত হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন[৯] —

যে সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করেছেন অথচ তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝেননি, যত বড় হোন না কেন, তাঁরা সাধারণতঃ অন্ধকারে হাতড়েছেন। আর, সেই জ্ঞানের সঙ্গে কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশে আছেই। তাঁরা অনেক আজগুবি খেয়াল দেখেছেন ও তার প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন।'

কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর বৈজ্ঞানিক মননশীলতারই পরিচয় বহন করে। তিনি বলেছেন[১০] :

'নিয়মিত সাধনা দ্বারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে। সমস্ত কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অন্য কোন বিজ্ঞানশিক্ষার সময় আমরা যেমন ক'রে থাকি, এতেও ঠিক সেই ধারার অনুসরণ ও যুক্তি বিচারকেই... আমাদের ভিত্তিস্বরূপ করতে হবে। কাজেই যখন কেউ নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করে, অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা বলতে থাকে, তার কথা শুনবে না।'

বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি স্বামীজীর বক্তব্য তা থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক। তিনি বলেন বিজ্ঞানের কাজ একত্বের (unity) আবিষ্কার করা। যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে হাজির হবে, তখনই তার অগ্রগতি থেমে যাবে। একথা ঠিক বলা হ'ল না। তখন বিজ্ঞানের ফলিত অধ্যায় বা প্রয়োগবিজ্ঞান যাত্রা সুরু করবে। একটি উদ্ধৃতি আবার তুলে ধরছি পুনরুক্তি দোষ হ'লেও।

ধর্মের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন,[১২]

---

১০. ঐ পৃ ২৭৯।

১২. স্বামী বিবেকানন্দ: হিন্দুধর্ম, ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, চিকাগো ধর্ম-মহাসভার নবম দিবসের বক্তৃতা।

'রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূলপদার্থ আবিষ্কার করে, যা থেকে অন্য সব পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে, তাহলে তা চরম উন্নতি লাভ করল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করতে পারে, অন্যান্য শক্তি যার রূপান্তর মাত্র, তাহলে ঐ বিজ্ঞানের কাজ শেষ হ'ল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করবে, যখন তাঁকে আবিষ্কার করবে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁর ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইভাবে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্মবিজ্ঞান অগ্রসর হতে পারে না।'

বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী। আর তাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর পরিচয়। এই পরিচয়ের প্রকাশ তাঁর জীবনের সর্ব সময়ে। একারণেই দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাব্রতের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা অনুশীলনের জন্য সমভাবে ব্রতী। তাই দেখা যায় তাঁর রচনাবলী বিজ্ঞানের উপমায় সমাকীর্ণ। 'সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব', 'প্রকৃতি ও পুরুষ', 'জগৎ', 'ধর্মবিজ্ঞান' প্রভৃতি রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক মতের বিস্ময়কর আলোচনা। ভারতকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হলে ব্যাপক বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন একথা তাঁর আগে এমনভাবে কোন ভারতীয় মনীষী বলেছেন ব'লে জানা নেই। জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বামীজীর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃতির যোগ্য—

'আমরা বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই।'

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে যুগের রেনেঁসীয় প্রবাহ থেকে

সরিয়ে নেননি, বরং যুগকে অতিক্রম ক'রে গেছেন অনায়াসে। বিংশ শতকের উষাকালে যিনি দেহরক্ষা করেছেন, তিনি মনোজগতে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূর প্রসারতার মূলে রয়েছে স্বচ্ছতা, কুসংস্কার বিমুক্ততা এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজ। তাঁর সমগ্র জীবন, তাঁর বিচিত্র কর্মধারা, তাঁর জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা বিশ্বে চিরবন্দিত হয়ে আছে। তারও মূলে বৈজ্ঞানিক ছন্দোবদ্ধতা। একারণেই তিনি আজও সমগ্র বিশ্বে বরণীয়, বন্দনীয় ও চিরস্মরণীয়।

●

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত গ্রন্থ পঞ্জী

১। Seal, B. N—Positive Sciences of the Ancient Hindus, Motilal Banarsidas, New Delhi.

২। Ray, P. C—History of Hindu Chemistry.

৩। সেন, সমরেন্দ্রনাথ—বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম, ২য় খণ্ড, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোঃ ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর।

৪। মজুমদার, রমেশচন্দ্র—প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা, বিশ্বভারতী।

৫। Sarker, B. K—Hindu Achievements in Exact Science, Longmans, 1918.

৬। Mukhopadhyaya, Girindranath—History of Indian Medicine, C. U. 1911.

৭। Majumder, G. P—Vanaspati Plants and Plant Life as in ancient treaties and traditions, C. U. 1927.

৮। The Cultural Heritage of India, Vol iii, Sri Ramkrishna Centenary Committee, Belur Math, Cal.

(i) Sengupta, P. C—Hindu Astronomy.

(ii) Dutta, B. B—Vedic Mathematics.

(iii) Sen, Gananath, M M—The Spirit and Culture of Ayurveda.

(iv) Majumder, G. P—Botany in India, Past and Present.

(v) Dhar, N. R—India's Contribution to Chemical Knowledge.

৯। Datta, Bibhuti Bhusan—The Science of Sulba : C. U.

১০। Mackay Ernest—The Indus civilization, Lovat Dickson & Thomson Ltd., London.

১১। দত্ত, রমেশচন্দ্র—ঋগ্বেদ সংহিতা।

১২। রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—হিন্দুরসায়নী বিদ্যা, বিশ্বভারতী।

১৩। Ghose, Ekendra Nath—'Studies in Rig-Vedic Deities—Astronomical and Meteorological', Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1932.

১৪। Brennand. W—'Hindu Astronomy'. Chas, Straker & Sons, London, 1896.

১৫। Shukla, Kripa Shankar—'Chronology of Hindu Achievements in Astronomy.' (Symposium in History of Science in South Asia, New Delhi, 1950).

১৬। দত্ত, রমেশচন্দ্র—ঋগ্বেদ সংহিতা।

নাম-সূচী

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ

॥ প্রবন্ধ ॥

ডঃ তারকমোহন দাস
আমার ঘরের আশেপাশে
নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত।
ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু** (জাতীয় অধ্যাপক) ৫·০০

উৎপল দত্ত
চায়ের ধোঁয়া ৬·০০

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু
নৈরাজ্যবাদ ১০·০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী ১২·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বাংলা কাব্য-প্রবাহ ১০·০০

শচীন্দ্র মজুমদার
বিবাহ-সাধনা ৩·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ৬·০০

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ৬·০০

উৎপল হোমরায়
শিশুতীর্থের পথ ৩·৫০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যের কথা ৬·০০

অলডাস হাক্সলি/দেবব্রত রেজ
সাহিত্য ও বিজ্ঞান ৫·০০

॥ উপন্যাস ॥

আশাপূর্ণা দেবী

অন্য মাটি অন্য রং ৬·৫০ ॥ **লঘু-ত্রিপদী** .. ৪·০০

দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা

[**অঘটনের শোভাযাত্রা**

অঘটনের সূত্রপাত

করুণা অলৌকিকী] একত্রে তিনটি উপন্যাস ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্য এক নাম .. ৪·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

আজও তারা ডাকে ৩·৫০ ॥ **এখানে মৃত্যুর হাওয়া** .. ৪·০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর মেলেনি .. ৩·৫০

দীপক চৌধুরী

এক যে ছিল রাজা .. ৫·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একই বৃন্ত .. ৬·০০

বাণী রায়

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ... ৬·০০

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নিঃসঙ্গ নায়ক ... ৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র রায়

প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প .. ৬·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীর ও প্রান্তর ... ৩·০০

দেবব্রত রেজ

প্রাণ-পাথেয় ৭·৫০ ॥ **স্বপ্নলোকের চাবি** ... ৩·৫০

॥ উপন্যাস ॥

অজিতকৃষ্ণ বসু

বাতাসী বিবি ৪·০০ ॥ **শেষ বসন্ত** ... ৪·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্বেতচন্দন তিলকে ... ৩·৫০

আলব্যার কাম্যু/প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচেনা ... ৪·০০

ডস্টয়েভস্কি/সমরেশ খাসনবিশ

সম্পাদনা : গোপাল হালদার

অপমানিত ও লাঞ্ছিত .. ৮·০০

হেরমান হেস/শিউলি মজুমদার

অমৃত আলোতে ... ৬·০০

ওসামু দাজাই/কল্পনা রায়

অস্তগামী সূর্য ... ৪·৫০

স্তেফান জোয়াইগ/দীপক চৌধুরী

উত্তরণ ॥ উন্মত্ত ॥ ত্রয়ী প্রতিটি ৩·০০

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কাদম্বরী ... ১২·০০

বরিস পাস্টেরনাক/দীপক চৌধুরী

ডাক্তার জিভাগো ... ১২·৫০

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত।

আলবার্তো মোরাভিয়া/চিত্তরঞ্জন মাইতি

দাম্পত্য-প্রেম ... ৪·০০

হেনরি জেমস্/অজিতকৃষ্ণ বসু

প্রেম এক মন্ত্র ... ৪·৫০

টমাস মান/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুর আমি নারী ... ৩·০০

আলেকজাণ্ডার লারনেট হলেনিয়া/বাণী রায়

মোনা লিসা ... ২·৫০

॥ গল্প-সংগ্রহ ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি
অনেক বসন্ত দুটি মন ... ৩.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বরবর্ণিনী ... ৩.০০

আভা পাকড়াশী
বসন্ত বৌরী ... ৩.৫০

স্তেফান জোয়াইগ/দীপক চৌধুরী
গল্প-সংগ্রহ [দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ] প্রতি খণ্ড ৫.০০

মোহনলাল গঙ্গোঃ ও অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চীনা মাটি (চীনা গল্প) ... ৬.০০

কারেল চাপেক/মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়
নীল চন্দ্রমল্লিকা (চেক গল্প) ... ৪.০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/অজিতকৃষ্ণ বসু
শহরতলির শয়তান ... ৪.৫০

॥ ভ্রমণ কাহিনী ॥

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা ... ৬.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
শৈলপুরী কুমায়ুন ... ৫.০০

॥ বিবিধ ॥

এককলমী (পরিমল গোস্বামী)
ইতস্ততঃ (রম্য রচনা) ... ৬.০০

অজিতকৃষ্ণ বসু
যাদু কাহিনী [যাদুকর ও যাদুবিদ্যার বিচিত্র কথা]
নরসিংহদাস পুরস্কার প্রাপ্ত ... ৮.০০

স্মৃতি-কথা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন [দ্বিতীয় পর্ব] ৭·০০

মহাদেবী বর্মা/মলিনা রায়

ছায়াময় অতীত ৪·০০

॥ কবিতা ॥

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

অঙ্গুষ্ঠ ২·০০

একটি ধানের শীষের উপরে (জাপানী কবিতা) ... ২·৫০

॥ নাটক ॥

গোপীনাথ নন্দী

জনতার কোলাহল ২·৫০

সন্ন্যাসীর গীত ... ১·৭৫

॥ কাব্য নাটিকা ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বসন্ত-বিলাপ ৪·০০

॥ কিশোর-গ্রন্থ ॥

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গড়জঙ্গলের কাহিনী (উপন্যাস) ৩·৫০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বোর্ডিং ইস্কুল (উপন্যাস) ...

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির রাজা ও অবিন ঠাকুর (শিল্পগুরুর জীবনকথা) ... ৩·০০

রবিন জিলিয়াকাস/পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকের কথা (ভারতীয় অসামরিক ডাকব্যবস্থার ইতিকথা) ৪·০০

এন. কারাজিন/সরিৎশেখর মজুমদার

উড়ে চলি দক্ষিণে

(সারসদের বিচিত্র অভিযান কাহিনী) ... ৩·৭৫